মরণজয়ী
মহীয়সী
মাওলানা শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী

সূচিপত্র

মরণজয়ী মহীয়সী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পৃথিবীকে সাজাতে মহান আল্লাহ বিচিত্রময় অসংখ্য মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ হলো সে-সবের সেরা সৃষ্টি। মহান আল্লাহ পাক একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারীদের বাদ দিয়ে দুনিয়া বিনির্মাণের কথা চিন্তা করা যায় না। ধন্য সেই আদমসন্তান, যিনি দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়ে শ্রেষ্ঠত্বের খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। সর্বোচ্চ সম্মানে সমাসীন হয়েছেন ইহকালে ও পরকালে।

পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান গণী ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম, একইভাবে নারীদের মাঝেও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা, হযরত আসমা, হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহুন্নার মতো পুণ্যাত্মা সাহাবীয়াগণ। শাহাদাতের পেয়ালা পিয়াসী যেমন ছিলেন হামযা, খুবাইব রাযি., তদ্রূপ ছিলেন সুমাইয়া, যায়নব, উম্মে রুম্মান রাযি.।

পার্থিব স্বার্থ বিলিয়ে দীনের মশাল প্রজ্বলিত করতে যেমন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আবূ বকর, ওসমান, আবদুর রহমান বিন আউফ রাযি., অনুরূপ অংশগ্রহণ করেছেন হযরত খাদিজা, উম্মে আনাস রাযি. প্রমুখ। সে কারণে দীনের পরিমণ্ডলে পুরুষ-নারী উভয়ের ভূমিকা সমভাবে গ্রহণযোগ্য, প্রশংসনীয় এবং আল্লাহর দরবারে বিনিময়োপযুক্ত। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকেই একধাপ

এগিয়ে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাকে কাজে অংশগ্রহণ ছাড়াই কর্মসম্পাদনকারী পুরুষের সমান প্রতিদান প্রদান করেছে।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী যুদ্ধের জন্য তার স্বামীকে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজের সতীত্ব সংরক্ষণ করে, ঘরের যাবতীয় মালামালের রক্ষণাবেক্ষণে অবতীর্ণ হয়, সে নারী পুরুষের পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হুরদের নেত্রী ঘোষণা দেবে। তারপর সে বেহেশতের পবিত্র পানিতে গোসল করে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে ইয়াকুতের ঘোড়ায় চড়ে প্রিয় স্বামীর অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ- যে ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী, কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। প্রতিদানে তাদের উত্তম কাজের কারণে তাদেরকে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।[১]

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ধর্মীয় সাফল্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী জাতি পুরুষের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা স্বল্প আমলের বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ শুনতে পান।

এখানে বিভিন্ন যুগে ইসলাম ও জিহাদের ময়দানে মহীয়সী নারীগণের অংশগ্রহণের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরা হলো।

---

১. সূরা নাহল-৯৭

চির বিপ্লবী নারী উম্মে উমারা রাযি.

প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতপূর্ণ আদর্শ নিকেতন বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছিল এমনসব পুণ্যপ্রাণ সঙ্গীদের উপস্থিতিতে, যাঁরা আল্লাহর সঙ্গে কৃতঅঙ্গীকার হরফে-হরফে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁরা নিজ জীবনে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন আল্লাহর দীন আর প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকিত আদর্শকে। ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান সেইসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তির অন্যতম হলেন হযরত উম্মে উমারা রাযিয়াল্লাহু আনহা। প্রকৃত নাম নাসিবা বিনতে কা'ব ইবনে আমর রাযি.। খাযরাজ বংশের এই মহীয়সী প্রিয় নবীর মাদানী সাহাবীগণের অন্যতম।

তাঁর ভাইয়ের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব আল-মাযানী রাযি. বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন ইসলামের পক্ষে। অবশেষে তিনি মদীনায়ই ইনতেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন হযরত ওসমান রাযি.। তাঁর দ্বিতীয় ভাই হযরত আবদুর রহমান বিন কা'ব রাযি.। তিনি সামানপত্রের অভাবে তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বলে কেঁদে-কেঁদে একদম ভেঙে পড়েছিলেন। তখন তাঁর এবং তাঁর মতো সামর্থ্যহীন অক্ষম ঈমানদারদের সান্ত্বনাস্বরূপ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ.

অর্থ- তারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।[১]

---

১. সূরা তাওবা-৯২

এতে সহজেই বোঝা যায় যে, হযরত উম্মে উমারা রাযি.-এর জন্ম হয়েছিল এক ভাগ্যবান আলোকোজ্জ্বল পরিবারে।

উম্মে উমারার প্রথম বিয়ে হয়েছিল যায়েদ ইবনে আসেমের সঙ্গে। হযরত যায়েদ ইবনে আসেম ইবনে কা'ব ইবনে মুনজির আল-আনসারিও ছিলেন একজন সুবিখ্যাত সাহাবী। ইসলামের প্রথম সারির সৈনিক। এই মহান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন বাইয়াতে আকাবার ঐতিহাসিক বৈঠকে। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন বদরযুদ্ধে। অহুদযুদ্ধেও শরীক ছিলেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। অবশ্য তাঁর সঙ্গে উম্মে উমারার বিয়ে হয়েছিল ইসলামের পূর্বকালে। তাঁর ঘরে হাবীব ও আবদুল্লাহ নামে দু'জন পুত্রসন্তান ছিল, তাঁরাও প্রিয় নবীর সম্মানিত সাহাবী রাযি.।

হযরত যায়েদের পর তিনি বিয়ে করেন গাযওয়া ইবনে আমর ইবনে আতিয়াকে। তিনিও ছিলেন একজন আনসারি সাহাবী। তাঁর এই সংসারে দুই সন্তান—যারাহ ও তামিম। তাঁরাও ইসলামের প্রথমকালে মুসলমান। তাঁরাও শরীক ছিলেন আকাবার বাইয়াতে এবং অহুদের যুদ্ধে।

কিন্তু হযরত উম্মে উমারার সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় অন্য জায়গায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মুসায়লামা দাবি করে নবুয়তের। এ নিয়ে সৃষ্টি হয় মহা তোলপাড়। প্রায় চল্লিশ হাজার যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে মুসায়লামা অবতীর্ণ হয় যুদ্ধে। বীর সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে অগ্রসর হন মুসলিমযোদ্ধাগণ। সঙ্ঘাত হয় প্রচণ্ড। প্রায় সত্তরজন হাফেজে কুরআন-সাহাবী এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে হযরত খালিদ বিন ওলিদ রাযি. মুসায়লামাকে সম্মুখ লড়াইয়ের আহ্বান জানালে; সে তার 'হাদিকাতুর রাহমান' নামক বাগিচায় গিয়ে আত্মগোপন করে। চারদিক থেকে প্রাচীর ঘেরা এই বাগানে আশ্রয় নেওয়ার পর প্রহরীরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন সাহাবী হযরত বারা ইবনে মালিক রাযি. সঙ্গীগণকে বলেন, তোমরা আমাকে ধরে দেয়ালের উপর ছুড়ে মারো। জানবাজ

বন্ধুগণ তাই করলেন। এই দুঃসাহসী সাহাবী উড়ে গিয়ে বাগানে পড়তেই এগিয়ে এলো বাগানের প্রহরী।

প্রবল রোষে দীপ্ত বারা রাযি. অবুঝ শিশুকে কাবু করার মতো প্রহরীদেরকে পদতলে ফেলে ছুটে যান ফটকের দিকে। ফটক মুক্ত করে দিতেই এগিয়ে আসে মুসায়লামা। কিন্তু মিছে লুকোবার চেষ্টা করে মিথ্যুক মুসায়লামা। হযরত উম্মে উমারার পুত্র আবদুল্লাহ রাযি. এবং হামযা রাযি.-এর ঘাতক হযরত ওয়াহশী[১] রাযি. ধরে ফেললেন মুসায়লামাকে। নাঙ্গা তলোয়ারের প্রচণ্ড আঘাতে কুপোকাত করে ফেললেন হযরত আবদুল্লাহ রাযি.। সেই সঙ্গে বর্শা দ্বারা আঘাত করেন হযরত ওয়াহশীও। এরপর খোদার দুশমন নবীজির চিরশত্রু মুহূর্তে দুনিয়া ছাড়া। নবুয়তের জঘণ্য দুশমন মুসায়লামাকে হত্যা করার কৃতিত্ব যে মহান মুজাহিদের, তারই গর্বিত জননী হযরত উম্মে উমারা রাযি.।

দ্বিতীয় পুত্র হাবিব ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম শরীক ছিলেন আকাবার শপথবৈঠকে। নবীজির হয়ে যুদ্ধ করেছেন অহুদ ও খন্দকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পার্থিব জীবনের শেষ সোপানে উপনীত। মিথ্যাবাদী মুসায়লামার পক্ষ থেকে চিঠি এলো। তার দাবি—সেও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নবী। তবে পুরো দুনিয়ার নয়। আধা পৃথিবীর। বাকিটার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর পাঠালেন এভাবে—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মুসায়লামা কায্যাবের নামে। সত্যপথ অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

পরকথা, সারা পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে

---

১. ওয়াহশী রাযি. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত হামযা রাযি.-কে হত্যা করেছিলেন।

চান, তাকেই তাঁর কর্তৃত্ব দান করেন। আর উত্তম পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য।

হেদায়েতের এই প্রদীপ্ত আহ্বান পৌঁছার পরও তার টনক নড়েনি। আলোর পথে ফিরে আসেনি। তার গোমরাহির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামে আরেকটি পত্র লিখেন এবং এই পত্রের দূত নির্বাচিত হন হযরত উমারার দ্বিতীয় পুত্র হাবীব। প্রিয় নবীজির বাণী নিয়ে তিনি পৌঁছে যান ভণ্ড মুসায়লামার আস্তানায়। চিঠি পেয়ে মুসায়লামা জ্বলে ওঠে চামচিকা যেভাবে জ্বলে ওঠে আলো দেখলে। বন্দি করে আল্লাহর রাসূলের দূত হযরত হাবীব রাযি.-কে। নির্যাতন চলে অবিরাম। আঘাতে-আঘাতে তিনি ক্লান্ত। তখন মুসায়লামা ভাবে এবার বোধহয় কাবু হয়ে গেছে হাবীব। বিরাট সমাবেশ ডাকে মুসায়লামা কায্যাব। বিশাল জনতার ভিড় ঠেলে ডেকে আনে হযরত হাবীবকে। সামনে আসতেই মুসায়লামা জিজ্ঞেস করে-

– তুমি কি বিশ্বাস করো মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

–হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

–তুমি কি বিশ্বাস করো আমি আল্লাহর রাসূল?

মুসায়লামার মুখ তখন রাগে রোষে বিবর্ণ। শরীর কাঁপছে। হযরত হাবিব রাযি. উপহাসের স্বরে বললেন,

–আমি শুনতে পাচ্ছি না।

কথাটি এভাবে কয়েকবার বললে মুসায়লামার মাথায় খুন চেপে গেল। চিৎকার করে ডেকে পাঠাল জল্লাদকে। আদেশ করল, একে জীবন্ত কেটে টুকরো-টুকরো করো। আদেশ পালিত হলো নির্মমভাবে। প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবীর এক একটি অঙ্গ কেটে-কেটে আলাদা করা হলো। মর্দে মুজাহিদ দৃঢ় বিশ্বাস, অসীম জজবা আর তরঙ্গায়িত নবীপ্রেমের শাশ্বত উপমা স্থাপন করে গেলেন নিজ জীবনকে তিলে-

তিলে বিলিয়ে দিয়ে। তাঁর শাহাদাতের সংবাদে বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আর জননী উম্মে উমারা! এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর নির্মম ঘটনা শুনে ক্ষোভে শোকে বোবা বনে যান। শপথ করে বলেন, আমি এর প্রতিশোধ নেব। কুদরতের কি বিস্ময়কর লীলা। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অবশেষে হযরত আবূ বকর রাযি.-এর শাসনামলে হযরত খালিদ বিন ওলিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে যখন মুসায়লামার উপর হামলা হয়, তখন মুসায়মালাকে হত্যা করেন এই হাবিবের সহোদর হযরত আবদুল্লাহ রাযি.। সঙ্গে ছিলেন হযরত ওয়াহশী রাযি.। শুধু কি তাই! হযরত উম্মে উমারা রাযি. নিজেও শরীক হয়েছিলেন হক-বাতিলের এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে। সে কি রুদ্ররূপ জননী! ডান হাতে নাঙ্গা তলোয়ার আর বাম হাতে বর্শা। মুসায়লামার যখন পতন হলো, তখন তাঁর চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক। চিৎকার করে বলে উঠেন, আল্লাহর দুশমন মুসায়লামা কোথায়? অথচ তাঁর শরীর তখন বিক্ষত। ঝরে পড়ছে তাজা রক্ত। আর মুসায়লামার পতিত মুখে তিনি দেখছেন তাঁর শহীদ পুত্রের বিজয়ী মুখ।

হযরত উম্মে উমারা রাযি. এর বাইয়াতে আকাবায় শরীক হবার ঘটনাটিও বেশ চমৎকার। তিনি নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে-

বাইয়াতে আকাবার রজনীতে আমিও উপস্থিত ছিলাম এবং বাইয়াতও নিয়েছিলাম অন্য সকলের সঙ্গে। সেটা এভাবে, পুরুষগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করলেন। হযরত আব্বাস রাযি. তখন নবীজির হাত ধরে আছেন। বাইয়াতপর্ব সমাপ্ত হবার পর দেখা গেল আমি আর উম্মে হানি বাকি। তখন আমার স্বামী আযয়াহ বিন আমর রাযি. নবীজির খেদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই দু'জন নারীও আমাদের সঙ্গে এসেছে। তারাও বাইয়াত গ্রহণ করতে চায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদেরকে যেসব বিষয়ে বাইয়াত করেছি, তাদেরও সেসব বিষয়ে বাইয়াত করে নিলাম। আর আমি মেয়েদের সঙ্গে হাত মেলাই না।

উল্লেখ্য, বাইয়াতে আকাবার এই দ্বিতীয় শপথ-অনুষ্ঠানটি সজ্ঘটিত হয়েছিল নবুওয়তের ত্রয়োদশ সালে। সত্তরজনের বেশি পুরুষ আর ভাগ্যবতী এই দুই নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এই ঐতিহাসিক শপথ-অনুষ্ঠানে। সুখে-দুঃখে, কালে-অকালে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য বিসর্জন ও বিপ্লবের বুনিয়াদি উৎস এবং পরবর্তীকালের বিস্ময়, ইসলাম ও উম্মাহ সেই বাইয়াতে আকাবারই উত্তম ফসল। উম্মে উমারার আরেকটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ইসলামী বিপ্লব ও চেতনাদীপ্ত বাইয়াতুর রিদওয়ানেও শরীক ছিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন মাথা মুণ্ডানো অবস্থায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের কথা সাহাবীগণকে জানালেন। শুনে সকলেই দারুণ খুশি! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন, তিনি শিগগিরই উমরা করতে যাবেন। এ কথা ছড়িয়ে পড়লে এক হাজার চারশ সাহাবীর বিশাল কাফেলা প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে চারজন-মাত্র নারী। সেই চারজন হলেন নবীজির জীবনসঙ্গিনী হযরত উম্মে সালামা রাযি. এবং উম্মে উমারা, উম্মে হানি ও উম্মে আমির রাযি.। কিন্তু কুরাইশরা পথে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে জ্বলে উঠে যুদ্ধের লেলিহান শিখা। সে এক কঠিন মুহূর্ত।

এ মর্মে হযরত উম্মে উমারার বর্ণনা শোনা যাক। তিনি বলেন, একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তাঁবুতে এলেন। তখন হঠাৎ করে সংবাদ এলো, হযরত ওসমান রাযি.-কে কুরাইশরা শহীদ করে দিয়েছে। তখন তিনি আমাদের তাঁবুতে বসে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাইয়াত গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। তখন বাইয়াত গ্রহণের জন্য মানুষের ঢল নামল এবং আমাদের সামানপত্র মাড়িয়ে একেবারে শেষ। আর মুসলমানগণ রণসাজে সজ্জিত। অথচ আমরা বের হয়েছিলাম উমরা করতে। আমাদের হাতে অস্ত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। আমার হাতে একটি শানিত তলোয়ার ছিল। আমি সেটা নিয়ে একটি খুটির কাছে দাঁড়িয়ে

গেলাম এবং বলে দিলাম, যদি কোনো বেঈমান আমার কাছে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করে ছাড়ব। হিজরী ষষ্ঠ সালে অনুষ্ঠিত বৃক্ষতলায় সম্পাদিত এই শপথকে বাইয়াতুর রিদওয়ান বলা হয়। এই বাইয়াত-অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁদের একজনও জাহান্নামে যাবে না। সুসংবাদের আলোয় উদ্ভাসিত এই ভাগ্যবানদের অন্যতম হযরত উম্মে উমারা রাযি.-এর মর্যাদাও ছিল ঈর্ষণীয়।

ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ। অহুদের যুদ্ধ। সাইয়েদুল মুজাহিদীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতশ সেনাসদস্য নিয়ে অহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। তাদের হাতে ছিল হাতেগোনা কয়েকটা তলোয়ার এবং নামমাত্র কিছু রসদসামগ্রী। তবে ঈমানী বলে বলীয়ান ছিল তাদের প্রত্যেকের হৃদয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় তাদের অন্তর ছিল ঠাসা।

অপর দিকে কাফের বাহিনী ছিল তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এবং সবাই ছিল তখনকার অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। অহঙ্কার, দাম্ভিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসছে তারা।

উভয়পক্ষ মুখোমুখি হলো। সাহাবীগণ তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। শুরু হলো এক প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ। হক ও বাতিলের যুদ্ধ। ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চাইছে যারা, তারা মুসলমানদের সম্মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। খড়-কুটার ন্যায় ভেসে যেতে লাগল কাফেরগোষ্ঠী। মুহূর্তের মধ্যে কাফেরদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল তাদের মাঝে। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হতভম্ব হয়ে পিছু হটতে লাগল।

কিন্তু মুসলমানদের সামান্য একটু ভুলের কারণে অনেক বড় মাশুল দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের চূড়ায় পঞ্চাশজনের এক ক্ষুদ্র বাহিনী মোতায়েন রেখেছিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যুদ্ধে জয় হোক বা পরাজয়, এখানে অবিচল থাকবে। কারণ যে কোনো মুহূর্তে পেছন থেকে আক্রমণ আসতে পারে।

কাফেরদের পিছু হটতে দেখে, যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন মনে করে তারা এখান থেকে সরে আসেন।

বিচক্ষণ খালেদ বিন ওলিদের চোখে এই দুর্বল দিকটি এড়িয়ে যায়নি। সেদিক দিয়েই হামলা করে বসলেন তিনি। মুসলমানরা কিছু বুঝে উঠতে পারল না। মার খেতে আরম্ভ করল তারা। ধরাশয়ী হতে লাগল একের পর এক।

কিন্তু কাফের-গোষ্ঠীর প্রকৃত আক্রোশ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তাই তারা সুযোগ বুঝে একযোগে হামলা করল আল্লাহর হাবীবের উপর। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি ও নাজুক মুহূর্তে যেসব মুসলমান জানবাজি রেখে লড়াই করে যাচ্ছিলেন, রাসূলকে রক্ষা করতে তাঁরা মুখোমুখি হলেন মৃত্যুর। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহীয়সী উম্মে উমারা রাযি.। তিনি যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন একের পর এক মুসলিম সেনা শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কাঁখের মশক পাত্র ফেলে দিয়ে রাসূলকে রক্ষা করার জন্য ছুটে এলেন তিনি। দেখলেন কাফের বাহিনী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে ফেলেছে। আর সামান্য ক'জন মুসলিম সৈন্য রাসূলের চারপাশে রক্ষণাত্মক আক্রমণ করছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। অস্ত্র নিয়ে বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাফেরদের মাঝে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন উম্মে উমারার হাতে ঢাল নেই। তাই একজন মুসলিম সৈন্যের ঢাল নিয়ে তাকে অর্পণ করলেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি রাসূলের প্রতি নিক্ষিপ্ত তির প্রতিহত করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন হিংস্র ইবনে কুমিয়া সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। দেখতে দৈত্যের মতো, মনে তার কুটিলতা। জিঘাংসার আগুন তার চেহারায় পরিস্ফুট।

উম্মে উমারা ও মুসআব ইবনে উমায়ের তাকে প্রতিহত করতে লাগলেন। একসময় মুসআব বিন উমায়েরকে সে শহীদ করে দিল।

এখন ইবনে কামিয়া ও উম্মে উমারা লড়ছেন। প্রাণপণ লড়াই। কেউ কাউকে ছাড়বার নয়।

এক প্রচণ্ড আঘাত উম্মে উমারার হাতে লাগল। তবু তিনি লড়ে যাচ্ছেন। একসময় সেই কাফের নিরুপায় হয়ে পলায়ন করল।

উম্মে উমারার এক ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে লড়ে যাচ্ছেন। রাসূলের প্রতি নিক্ষিপ্ত তির তরবারির আঘাত প্রতিহত করছেন। হঠাৎ এক কাফের এসে তাঁর উপর আক্রমণ করল। এতে তাঁর হাত বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হলো। ইতিমধ্যে হযরত উম্মে উমারা রাযি. কাফেরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। তরবারির উপর্যুপরি আঘাতে তার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। একপর্যায়ে সে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে উমারার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। বললেন, 'উম্মে উমারা! তুমি যা করতে পারো, অন্য কেউ তা পারে না। তুমি তার থেকে তোমার ছেলের যথেষ্ট বদলা নিয়েছ। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান প্রভুর, যিনি তোমাকে প্রতিশোধ নেওয়ার তৌফিক দান করেছেন।'

আল্লাহর রাসূল ও দীনে ইসলাম রক্ষার্থে উম্মে উমারার ভূমিকা পুরুষদের বীরত্বকেও হার মানায়। এমন নাজুক মুহূর্তে তিনি এত কিছু করে দেখালেন! একজন নারী এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারে!

হযরত উম্মে উমারা রাযি.-এর কাঁধের আক্রমণের ক্ষতটি এতই গভীর ছিল যে, হাত ঢুকে যেত!

ইসলামের জন্য নারীদের কত ত্যাগ। কত কুরবানি। বীরাঙ্গনা উম্মে উমারার বীরত্বপূর্ণ কীর্তির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করেছেন। তাঁর প্রশংসা করেছেন। প্রিয় নবীর প্রশংসাবাণী দ্বারা ধন্য হয়েছেন তিনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে উমারার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমাদের পরিবারে বরকত নাজিল করুন। তোমার মায়ের অবস্থান অমুক অমুক সাহাবীর চেয়েও উর্ধ্বে।'

উম্মে উমারা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুআ করুন যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! এদেরকে জান্নাতে আমার সাথী বানিয়ে দাও।'

রাসূলের মুখ নিঃসৃত এই দুআ শুনে হযরত উম্মে উমারা রাযি. দারুণ খুশি হলেন। খুশির বন্যা বয়ে গেল হৃদয়ে। আনন্দে দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ল। সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলেন তিনি।

এই ভাগ্যবতী নারী যখন ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন, তখন তার সেবায় এগিয়ে যান খোদ সেনাপতি খালিদ বিন ওলিদ এবং শুশ্রূষায় অভিজ্ঞদের তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেন। খলীফা হযরত আবূ বকর ও উমর রাযি. তাঁর যত্ন নিতেন যথাসাধ্য। অবশেষে প্রিয় নবীর নিখাদ ভক্ত, আল্লাহর দীনের একনিষ্ঠ সেবিকা, নববী আদর্শের আপোষহীন পতাকাবাহী এই মহীয়সী হিজরী ১৩ সালে স্বীয় প্রভুর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় নেন। চিরনিদ্রায় শায়িত হন জান্নাতুল বাকিতে। রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।

হযরত খানসা রাযি.-এর বীরত্ব

আমিরুল মুমিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. এর শাসনামল। খলীফার পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হলো সেই যুগের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রনায়ক পারস্য সম্রাটের কাছে। তিনি ইসলামের মহান দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

পারস্য সম্রাট রাগে-ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার লক্ষ্যে, যেন অতীতের সকল যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাবীর রুস্তমকে সেনাপতি করে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের সুসজ্জিত এক বিশাল বাহিনী কাদেসিয়ার প্রান্তরে প্রেরণ করেন। পারস্য সম্রাটের এই হিংস্র সিদ্ধান্তের সংবাদ পেয়ে আমিরুল মুমিনীন খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের একটি দল ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৬ হিজরীতে তাদের মোকাবেলার জন্য কাদেসিয়ায় পাঠান। এই যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর হাতে পারস্য সম্রাটের বিশাল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। মহাবীর রুস্তম নিহত হয়। মুসলমানদের ঈমানী পরীক্ষার এই কঠিন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন মহিলা সাহাবী হযরত খানসা বিনতে আমর ইবনুশ শারিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা। এ নামেই তাঁকে ডাকা হত এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসের সোনালি পাতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

খানসা মানে হরিণী। তিনি ছিলেন নজদের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম আমর ইবনুশ শারিদ। তিনি কায়েস গোত্রের সল্‌ম খান্দানে

জন্মগ্রহণ করেন। সল্‌ম খান্দানের রাওয়াহা ইবনে আবদুল আজিজ সালামার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর এই বৈবাহিক জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। স্বামী যুবক রাওয়াহা অল্প বয়সে মারা যান। পরে মুরশাদ ইবনে আবূ আমের নামে আরেক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সেই যুগের আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হিসেবে তাঁর ছিল বিশেষ খ্যাতি। তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করে 'উসদুল গাবা' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন, সকল কাব্যরসিক এই ব্যাপারে একমত যে, খানসার আগে বা পরে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মহিলা কবির জন্ম হয়নি। উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ কবি জারিরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ যুগের সবচেয়ে বড় কবি কে? জবাবে তিনি বলেন, খানসা না হলে আমি হতাম।

মক্কার আকাশে রিসালাতের সূর্য উদিত হয়ে চারদিক আলোর আভা বিকিরণ করলে হযরত খানসার চক্ষু সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পরিবারের আরও কয়েক সদস্যের সঙ্গে রাহমাতুল্লিল আলামীন দীর্ঘক্ষণ তাঁর কবিতা শোনেন। তার কাব্যপ্রতিভায় বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হন। কাব্যের সেই উৎকর্ষের যুগে শতাধিক মহিলা কবির নাম শোনা যায়। তাদের মধ্যে খানসা ছিলেন সবার শীর্ষে।

এ যুদ্ধে হযরত খানসা একা অংশ নেননি। তিনি তাঁর চার পুত্রসন্তান নিয়ে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে যাবার আগের রাতে তিনি তাঁর বংশীয় ঐতিহ্য তুলে ধরে ছেলেদের উদ্দেশে মর্মস্পর্শী এক ভাষণ দান করেন। তাঁর এ ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল পুত্রদেরকে বীরের বেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা। তিনি বললেন,

'আমার প্রিয় সন্তানেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ। স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা যেমনি আমার গর্ভের ধন, ঠিক তেমনই তোমার পিতার সৎ-সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সঙ্গে প্রতারণা করিনি। তোমাদের মাতুল-গোত্রকেও লাঞ্ছিত করিনি। তোমাদের বংশধারা নিষ্কলঙ্ক। তোমরা

জানো, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার। এ অস্থায়ী জীবন তুচ্ছ, নগণ্য, আখেরাত হলো আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান।

এরপর জিহাদের ময়দানে অবিচল থাকার জন্য তিনি তাঁর সন্তানদের কুরআনে করীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান,

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ- হে মুসলমানগণ, তোমরা ধৈর্যধারণ করো, অপরকে ধৈর্যের তালিম দাও এবং সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভে সামর্থ হবে।[১]

হে আমার কলিজার টুকরো সন্তানেরা! তোমরা যখন দেখবে, তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে আর তার স্ফুলিঙ্গ চারদিকে জ্বলজ্বল করছে, তখন তোমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা করবে। ইনশাআল্লাহ, পরকালের কামিয়াবি লাভে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।'

মায়ের উপদেশ অনুযায়ী ইসলামের সৈনিকেরা প্রত্যেক্ষ রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ইতিহাসের পাতায় শৌর্য-বীর্য আর সাহসিকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত একে একে সকলে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

জননী হযরত খানসার কাছে চার সন্তানের শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছলে, এই বীরমাতা কলিজার টুকরো সন্তানদের জন্য একটুও আফসোস, অনুতাপ, দুঃখ না করে বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, চার শহীদের মা হবার সৌভাগ্য ও মর্যাদা যিনি দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহর নিকট আমার

---

১. সূরা আ-লে ইমরান : ২০০

প্রত্যাশা, আমি তাঁর রহমতের ছায়ায় আমার সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে এমন আরও অনেক বীরাঙ্গনা জননীর কাহিনী পাওয়া যাবে, যাঁরা দীনের জন্য তাদের জান, মাল এবং তাদের কলিজা-ছেঁড়া ধনকে পর্যন্ত কুরবানি করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু আফসোস, বর্তমান বিশ্বের যে করুণ অবস্থা, যে দিকেই কান পাতি শুধু মুসলমানদের হাহাকার আর আর্তনাদ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। উম্মাহর এই করুণ মুহূর্তে তাঁর মতো বীরমাতাদের বড়ই প্রয়োজন, যাঁরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে যোগদান করবে জিহাদের ময়দানে।

হযরত আসমা বিনতে জিয়াদ রাযি.-এর বীরত্ব

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস। আগের সেই আনন্দ আর নেই। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা একফালি হাসি আর দেখা যায় না। হৃদয়তন্ত্রিতে আহ্লাদের সুরমূর্ছনা এখন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে না। চোখের তারায় এখন আর স্বপ্নরাজ্যের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে না। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে তার।

নিঝুম রাতে রাজপ্রাসাদের সুকোমল বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই রাজ্যের চিন্তা জমা হয় মাথায়। এলোমেলো দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করে চেতনায়। নিঃস্ব আরব বেদুইনেরা এত সাহস, এত শক্তি পেল কোথায়। মানছে না কোনো বাঁধা। যেদিকে যাচ্ছে মরু সাইমুমের মতো সবকিছু তছনছ করে ফেলছে। বাধভাঙা জোয়ারের ন্যায় ধেয়ে আসছে। সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে ঝড়ো গতিতে। আকাশের বিজলিও যেন তাদের তরবারির কাছে হার মেনে গেছে। কোনো শক্তিই তাদের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। রুখতে পারছে না তাঁদের বিজয়কে। বিপুল শক্তির অধিকারী রোমান সৈন্য পর্যন্ত ব্যর্থ হলো এই আরব বেদুইনদের কাছে। না, সহ্য করা যায় না আর। দ্রুত ব্যবস্থা একটা নিতেই হবে। দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে ওদের। তাদের শক্তি, সাহস, হিম্মত, একেবারে ভেঙে দিতে হবে। বিজয়ের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেব তাদের। চিন্তা করতে লাগলেন সম্রাট হেরাক্লিয়াস। কিন্তু কীভাবে? কোন্ পদ্ধতিতে তা সম্ভব?

না, এভাবে আক্রমণ করে তাদের রোখা যাবে না। এবার কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। শুধু রোমান বাহিনীকে দিয়ে হবে না। খ্রিস্টধর্মের নামে যুদ্ধের ডাক দিতে হবে। উসকে দিতে হবে সকল পাদরিকে। সমগ্রজাতির ধর্মীয় চেতনায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে।

ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জীবন দিতে ছুটে আসবে সবাই। হ্যাঁ, এবার সাফল্য আসবেই। পেছনের চূড়ান্ত প্রতিশোধ এবার নিতেই হবে।

সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার পরিকল্পনায় পূর্ণ সফল হলেন। দারুণ সাড়া পাওয়া গেল এতে। পুরো রোমান সাম্রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। বাড়তে-বাড়তে তাদের সেনা সংখ্যা আট লাখে পৌঁছে গেল।

বিশাল এই বাহিনী সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আত্মগৌরব, দাপট ও অহঙ্কারে টইটুম্বুর তাদের হৃদয়। দারুণ ছন্দে আছে তারা। অবয়বে জিঘাংসার নিদর্শন স্পষ্ট।

মুজাহিদ বাহিনী তখন হিমসে অবস্থান করছে। বিশাল বাহিনীর সংবাদ পেয়ে গেল তারা। সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ ভাবনায় পড়ে গেলেন। এই মুষ্টিমেয় মুজাহিদ নিয়ে এত বিশাল বাহিনীর কীভাবে মোকাবেলা করা যায়? কোন্ পন্থা অবলম্বন করব এখন!

হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি. পরামর্শ করলেন, এই বিশালবাহিনীর মোকাবেলার জন্য হিমস উপযুক্ত স্থান নয়। এর জন্য দরকার বিশাল প্রান্তর। প্রশস্ত মাঠ। তাই ইয়ারমুকের প্রান্তরই সবার পছন্দ হলো।

ফয়সালা অনুযায়ী মুজাহিদ বাহিনী ইয়ারমুকের দিকে প্রত্যাবর্তন করল। মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার মুসলিম ফৌজ। অপরদিকে আট লক্ষ খ্রিস্টান। কিন্তু মুসলমানরা তো অস্ত্র আর সেনাবলে লড়ে না। আল্লাহর সাহায্যই মুসলমানদের প্রধান শক্তি। দীর্ঘ ছয় মাইলজুড়ে খ্রিস্টানবাহিনীর অবস্থান। ছাউনির পর ছাউনি। যেন এর শেষ নেই। বিভিন্ন অঞ্চলের যোদ্ধারা এতে অংশ নিয়েছে। এমনকি আরব সর্দার যাবালা ইবনে আইহাম দুর্ধর্ষ ষাট হাজার আরব সেনা নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

এতদসত্ত্বেও হেরাক্লিয়াসের অভিপ্রায় ছিল যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে চলা। সন্ধি করার চেষ্টাই বেশি করতে হবে। কিন্তু কোনো ফল হলো

না। যুদ্ধ বেঁধে গেল। ভয়াবহ পরিস্থিতি। মরণপণ যুদ্ধ। চলছে তো চলছেই। পাঁচদিন যুদ্ধ চলল।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনটি ছিল বেশি ভয়াবহ। অত্যন্ত ভয়ানক। সেদিন রোমান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল মুসলিম জানবাজদের জন্য। বার-বার মুজাহিদগণ পিছু হটছিল। মুসলিম রমণীরা তাঁদের তিরস্কার ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে আবার ময়দানে পাঠাচ্ছিলেন। আবূ সুফিয়ানকে পিছু হটতে দেখে হিন্দা বললেন, আবূ সুফিয়ান কোথায় যাচ্ছ? ফিরে যাও। জীবন উৎসর্গ করে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যত যুদ্ধ করেছ এর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় আজ।

নারীদের মধ্যে হযরত উম্মে আবান, উম্মে হাকিম, আসমা বিনতে আবূ বকর, হযরত খাওলা, হযরত উম্মে সালামা ও হযরত লুবানা রাযি. অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে এর মধ্যে যাঁর বীরত্ব ছিল তুলনাহীন, যাঁর ভূমিকা ছিল সবার ঊর্ধ্বে, যাঁর সাহসিকতা-রণদক্ষতা ছিল অবিস্মরণীয়, তিনি হলেন হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ ইবনে সাকান রাযি.।

যখন রণাঙ্গন পুরোপুরি উত্তপ্ত হয়ে উঠল, যুদ্ধের লেলিহান শিখা যখন দাউ দাউ করে উঠল, তলোয়ারের ঝনঝনানিতে যখন চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল, তখন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। ভুলেই গেলেন তিনি একজন নারী। শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা তাঁকে পাগল করে তুলেছে। অগ্রসর হয়ে গেলেন যুদ্ধের দিকে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কিন্তু কী দিয়ে লড়বেন তিনি? তাঁর নেই কোনো তলোয়ার। বর্শা-বল্লমও নেই তাঁর হাতে। তির-ধনুকও নেই। সামনে পেলেন তাঁবুর খুঁটি। যথেষ্ট। তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসারির ভেতর। সর্বশক্তি ব্যয় করে চললেন তিনি শত্রুনিধনের মহড়ায়। দারুণ লড়ছেন তিনি। হাতের খুঁটি দিয়ে। ডানে বামে হামলা করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। একে-একে নয়জন রোমান সৈন্যকে যমালয়ে পাঠালেন এই বীরাঙ্গনা। চিরতরে তাদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিলেন।

পাঁচ দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে মুসলমানদের বিজয় হলো। বহু রোমান সেনা প্রাণ হারাল। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। ইয়ারমুক প্রান্তরে শুধু লাশই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক লক্ষাধিক লাশের এক মহাসমাবেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজির পাওয়া দুষ্কর।

রোমানদের অতীতের সব অহঙ্কার, অহমিকা মাটিতে মিশে গেল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তাদের অহমিকা। অপর দিকে মুসলমানদের জজবা ও উদ্দীপনা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেল।

এ যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল মনে রাখার মতো। তাঁদের মধ্যে হযরত আসমা বিনতে যিয়াদ রাযি.-এর বীরত্ব ছিল অতুলনীয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের এবং তাঁদের পথে চলার তৌফিক দান করুক। আমীন।

বীরাঙ্গনা হযরত খাওলা রাযি.

১৩ হিজরী। চারদিকে ইসলামের জয়জয়কার। ইসলামের সুশীতল হাওয়া বইছে এখন আরবের বাইরেও। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. খেলাফতের মসনদে সমাসীন। ইসলামের সমস্ত কিছু আন্‌জাম দিয়ে যাচ্ছেন সুচারুভাবে। বীর মুজাহিদগণ দূর-দূরান্তে, দেশ-দেশান্তরে ছুটে চলছেন। চারদিকে ইসলামের হেলাল পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। জীবনবাজি রেখে দীনের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন মুজাহিদগণ। দেশের পর দেশ জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। অনেকে শাহাদাত বরণ করছেন আবার অনেকে বিজয়মাল্য নিয়ে ফিরছেন। বেশ ছন্দের সঙ্গে চলছে ইসলামী জীবনধারা।

এর মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ কবিলা আসাদ বিন খুজায়ফার দুই সহোদর হযরত যিরার বিন আযওয়ার ও হযরত খাওলা বিনতে আযওয়ার রাযি. অন্যদের চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁদের বীরত্ব ও সাহসিকতা ভোলার মতো নয়। তাঁদের সমর অভিজ্ঞতা, রণদক্ষতা, বীরত্বপূর্ণ অমর কীর্তি আজও মুমিনদের অন্তরে জিহাদী চেতনা উজ্জীবিত করে তোলে।

হযরত যিরার রাযি.-এর রণদক্ষতা ছিল অসাধারণ। সারা আরবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি কখনও বর্ম পরিধান করে ময়দানে অবতীর্ণ হতেন। কখনওবা বর্ম ছাড়াই রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাঁকে এক হাজার যোদ্ধার সমতুল্য মনে করা হত। রোমসাম্রাজ্যে সঙ্ঘটিত যুদ্ধসমূহে হযরত যিরার ও হযরত খাওলা রাযি. অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের উপমা পেশ করেন। তাঁদের বীরত্বগাঁথা এখন সরাসরি রণাঙ্গন থেকেই উপভোগ করব আমরা।

মুজাহিদ বাহিনী হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক অবরোধ করে নিল। সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ রাযি. গোয়েন্দা মারফত জানতে পারলেন সিরিয়াবাসীদের সাহায্যার্থে রোমানদের একটি দল দামেস্ক অভিমুখে এগিয়ে আসছে। তাঁদের নির্বিঘ্নে আসতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ। তাই হযরত যিয়ার রাযি.-কে ডেকে নির্দেশ দিলেন, যিরার! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি অগ্রসর হও। রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে পথেই প্রতিরোধ গড়ে তোলো।

মুসলিম সেনাগণ অগ্রসর হয়ে জানতে পারলেন রোমানদের সৈন্যসংখ্যা ১২ হাজার। সে তুলনায় মুসলিমবাহিনী ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই কিছু মুজাহিদের অভিমত ছিল এত সামান্য সেনা নিয়ে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু হযরত যিরার রাযি. কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না। বীরদর্পে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রোমান সেনাদের মাঝে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। একের পর এক শত্রু নিধন করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন যিরার রাযি.। এক পর্যায়ে শত্রুদের সেনাপ্রধান ওয়ার্দানের নিকট পৌঁছে গেলেন তিনি। সে ছিল বহু সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। যিরার মরণপণ আক্রমণ করলেন। হঠাৎ একটি তির এসে আঘাত হানল যিরার রাযি. এর বাহুতে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পাল্টা আক্রমণ করে চিরতরে খতম করে দিলেন তির নিক্ষেপকারীকে।

যুদ্ধের অবস্থা রোমানবাহিনীর প্রতিকূলে দেখে নিজেদের ব্যূহ সঙ্কুচিত করতে লাগল তারা। মুজাহিদগণ যিরারের সাহায্যে এগিয়ে আসতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর ঘোড়া হোঁচট খেয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে রোমানবাহিনী হযরত যিরার রাযি.-কে বন্দি করে ফেলল।

মুজাহিদগণ যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে পরিস্থিতি অবগত করানোর জন্য একজন দ্রুতগামী আশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদের নিকট। যিরার রাযি.-এর বন্দি হওয়ার

সংবাদ শোনামাত্র বিদ্যুৎ খেলে গেল খালেদ বিন ওলিদের দেহে। বজ্র হুঙ্কার তাঁর...

'কাফেরগোষ্ঠির এত স্পর্ধা! এত শক্তি ওদের! না, আর সহ্য করা যায় না। যে কোনো মূল্যে যিরারকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ রাযি. যুদ্ধের মোড় রোমানদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এবং ব্যাপক হামলার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম বাহিনী বীরদর্পে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ সেনাপতি খালেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল লাল রঙের তেজি ঘোড়ায় আরোহিত এক ব্যক্তির উপর, যাঁর রণকৌশল, সমরদক্ষতা ও বীরত্ব তাঁর চলাফেরায় টপকে পড়ছিল। লৌহবর্মের উপর কালো পোশাকাবৃত সেনাটিকে চেনার উপায় নেই। সবুজ পাগড়ি দ্বারা কোমর কষে বেঁধে রেখেছে সে। হাতে ধারালো তীক্ষ্ণ চকচকে একটি বর্শা শোভা পাচ্ছে। ভীষণ ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে সেনাপতি খালিদ।

লড়াই শুরু হয়ে গেল। ভয়াবহ যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাঝে সেই সেনাটি দেখা যাচ্ছে। অশ্বারোহী সৈনিকটি রোমানদের উপর এমনভাবে আক্রমণ করছে যেন আহত সিংহ। শত্রুবাহিনীকে তছনছ করে দিল সে। তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে গেল তাদের মাঝে। শত্রুবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে বিদ্যুৎ বেগে চার-পাঁচজন শত্রু সেনাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়ে আবার নিজ জায়গায় ফিরে আসে সে।

অনুপম রণদক্ষতা তাঁর। লাশের স্তুপ গড়ে তুলল সে। মুজাহিদীনের মাঝে কৌতূহল জাগ্রত হলো। কে এই বীর, যার বীরত্বের সামনে খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাচ্ছে শত্রুবাহিনী।

দ্বিতীয়বার আক্রমণ হলো। এবার সেনাপতি খালেদ রাযি. সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অশ্বারোহীকে দেখতে পেলেন। তার দেহ ক্ষতবিক্ষত। ঘোড়া তাঁর ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত। তবু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সে। একেবারে শত্রুবাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়ল। যখনই কোনো শত্রু তাঁর সামনে

আসে প্রাণের মায়ায় সে দৌড়ে পালায়। প্রায় একাই সে শত্রুবাহিনীকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। রোমানদের হিম্মত নেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবার। তাঁর দক্ষতা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন সেনাপতি খালেদ রাযি.। কিন্তু কেউ তাঁকে চেনে না। তাঁর পরিচয় জানেন না খোদ সেনাপতিও। তাই তাঁকে লক্ষ করে তিনি বললেন, দারুণ রণদক্ষতা দেখালে তুমি। কে তুমি? তোমার পরিচয় কী? অশ্বারোহী নীরব দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো সাড়া নেই।

হে বাহাদুর যুবক, তুমি আমাকে এবং পুরো মুসলিমবাহিনীকে অস্থিরতায় ফেলে দিয়েছ। কেন তোমার পরিচয় লুকাচ্ছ? আমি সেনাপতি, তোমার পরিচয় জানার অধিকার আমার আছে। বলো, কে তুমি?

এবার অশ্বারোহী মুখ খুলল। অবনত মস্তকে মেয়েলী কণ্ঠে বলতে লাগল, আমি নারী। তাই পরিচয় দিতে সঙ্কোচবোধ করছি। আমার হৃদয়ের ব্যথা আমাকে রণাঙ্গনে টেনে এনেছে। আমার নাম খাওলা। আমি যিরারের বোন। তাঁর বন্দিত্বের কথা শুনে ময়দানে এসেছি।

তাঁর কথা শুনে হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি. কেঁদে ফেললেন। একজন নারী এত বীরত্ব দেখাতে পারে? তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। আশীর্বাদ জানাই তোমার বীরত্বকে। শান্ত হও হে মেয়ে। তোমার ভাই যদি বেঁচে থাকে তবে অবশ্যই তাকে মুক্ত করা হবে। আর যদি সে শহীদ হয়ে যায় তবে তাঁর প্রত্যেক ফোঁটা রক্তের বদলা নেওয়া হবে রোমানদের থেকে।

এরপর নব উদ্যমে মুসলিম বাহিনী রোমান সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে বীরাঙ্গনা খাওলা রাযি.। এক পর্যায়ে তাঁরা হযরত যিরার রাযি.-কে শত্রুবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করে আনলেন।

দামেস্ক এখনও পুরোপুরি মুসলমানদের আয়ত্তে আসেনি। রোমসম্রাট হেরাক্লিয়াস বিরাট এক বাহিনী আজনাদিন নামক স্থানে পাঠালেন। গোয়েন্দা মারফত সেনাপতি খালেদ তা জানতে পারলেন। তাই তিনি এ নিয়ে পরামর্শসভা আহ্বান করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

মুসলিম বাহিনী সাময়িকভাবে দামেস্কের অবরোধ তুলে নিল এবং সকল মুজাহিদ আজনাদিনের দিকে অগ্রসর হলো। সেনাদের নিয়ে সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ রাযি. আগে রওনা হলেন। মহিলা ও শিশুদের নিয়ে হযরত আবূ ওবায়দা রাযি. পেছনে আসছিলেন।

রোমান সেনাপতি পিটার ও পোলাসন খুশিতে নাচতে লাগল। এই তো মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। ওদের যুদ্ধের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার এই তো মোক্ষম সুযোগ।

যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। কালবিলম্ব না করে উভয় সেনাপতি মিলে ষোলো হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের অতর্কিত হামলায় কিছু মহিলা বন্দি হলো রোমানদের হাতে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বীরাঙ্গনা খাওলা রাযি.।

রোমান সৈন্যরা বন্দিদের উপর নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করল। আর শান্ত থাকতে পারলেন না হযরত খাওলা রাযি.। যেন তাঁর সারা অঙ্গে আগুন ধরে গেল। ঈমানী জজবায় জোশ খেলে গেল। ফুঁসে উঠলেন তিনি। যেন ক্ষুধার্ত বাঘিনী। তিনি অন্য বন্দিনীদের লক্ষ্য করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন।

'হে আমার মুসলিম বোনেরা! আমরা আরবের সন্তান। এরচেয়ে বড় কথা হলো আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা। সুতরাং কাফেরদের হাতে বন্দিনী হয়ে আমরা বাঁচতে চাই না। আমরা আমরণ লড়ে যাব।

হে হিমইয়ারের কন্যারা! হে তুব্বার মেয়েরা! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, রোমানরা তোমাদের বাঁদী বানিয়ে রাখবে? কোথায় তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ? কোথায় তোমাদের বীরত্ব, যা আরবের বড়-বড় মজলিসে আলোচনা করা হয়। ছোট ছেলে-মেয়েরা সেই বীরত্বের কবিতা আবৃত্তি করে।'

পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁদের গতিরোধ করতে পারে না। বন্দি নারীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল হিমইয়ারি ও তুব্বা গোত্রের। তাঁরা

নিশানা নির্ধারণ ও সাহসিকতায় ছিল অদ্বিতীয়। খাওলার আগুনঝরা বক্তৃতায় তাঁদের নিভে যাওয়া আগুন আবার দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। টান-টান উত্তেজনা বিরাজ করছে সবার মধ্যে। উদ্দীপনার ঢেউ খেলে গেল সবার তনুমনে। সবাই সমস্বরে বলে উঠল, আমরা প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য। তবে কী দিয়ে লড়ব আমরা? আমাদের তো নেই অস্ত্র।

হযরত খাওলা রাযি.-এর কণ্ঠ আবার বেঁজে উঠল, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসীরা অস্ত্রের উপর ভরসা করে না। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুর মোকাবেলায়। আল্লাহর নুসরত আমাদের সাথী। চলো, আমরা তাঁবুর খুঁটিগুলো তুলে নিই। এগুলোই আমাদের অস্ত্রের কাজ দিবে। হয়ত শাহাদাত অথবা গৌরবময় বিজয় অর্জন করব। কিছুতেই তাদের হাতে বন্দি হব না।

হযরত খাওলা রাযি. নারীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রোমান সৈনিকেরা মুসলিম নারীদের ঘিরে নিল। জানবাজ আরব-নারীরাও এত সহজে দমবার নয়। শুরু হলো লড়াই। তুমুল লড়াই। আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগল মুসলিম রমণীরা রোমান সৈনিকদের উপর। মুসলিম নারীদের উপর্যুপরি হামলায় ৩০ জন রোমান সেনা প্রাণ হারাল। আহত হলো আরও অনেক।

এতক্ষণে সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ রাযি. মুসলিম নারীদের বন্দি হওয়ার খবর জেনে গেছেন। তৎক্ষণাৎ একটি সেনা ইউনিট সেদিকে রওনা করিয়ে দিলেন।

মুসলিম মুজাহিদগণ ক্ষিপ্র গতিতে পেছন দিকে এসে রোমানদের উপর থেকে আক্রমণ করে বসল। তাকবীর ধ্বনিতে কেঁপে উঠল পুরো রণাঙ্গন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমানরা লেজ গোটাতে লাগল। অস্ত্রশস্ত্র ফেলে তারা ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করল। ইতিমধ্যে হযরত যিরার রাযি. সেনাপতি পিটারকে দূরে দেখতে পেলেন। পরক্ষণেই একটি তির ছুটে গেল রোমান সেনাপতি পিটারের দিকে। সে কুপোকাত। এভাবে

আল্লাহ তায়ালা হযরত খাওলা রাযি.-এর দলকে এক মহাবিজয় উপহার দিলেন। মুসলিম মহিলাগণ সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। মহান আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন তাঁরা।

রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রত্যেকটি যুদ্ধে বীরাঙ্গনা খাওলা রাযি. অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি পরবর্তীকালের মুসলিম রমণীদের জন্য রেখে গেছেন আদর্শ উপমা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তওফিক দান করুন।

হযরত আসমা রাযি.: অসীম সাহসী এক নারী

নিঝুম রাত। চারদিক গভীর নিস্তব্ধতায় ছেয়ে আছে। দিগন্ত বিস্তৃত বালু সাগরের মাঝে বসন্তের সজীবতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট নগরী মক্কাকে আপন করে নিয়েছে আকাশের চাঁদ। তারকারাজি অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে পৃথিবীর আয়োজন। সমগ্র মক্কা নগরী ঘুমে বিভোর। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই, নেই কোনো হাঁক-ডাক। তবে জেগে আছে শুধু একদল ঘাতক কাফের। একটি জঘন্য রক্তপাত, একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উন্মাদনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের চারপাশে ওঁত পেতে আছে তারা।

তাদের দাবি সকল ফেতনার মূল হলো এই মুহাম্মাদ! অধিকার আধিপত্য বিস্তার করতে গভীর ষড়যন্ত্র করছে সে। পূর্বপুরুষদের চিরচেনা ধর্মের পরিবর্তে এক নতুন ধর্মের প্রতি আহ্বান করছে। তার যাদুমাখা কথামালা সমাজের কিছু লোককে তার দলে ভিড়াচ্ছে। বংশের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করছে অহরহ। সুতরাং তাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে না দিলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করতে হলে এরচেয়ে সুষ্ঠু সমাধান আর হতে পারে না।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে তাদের সকল আয়োজনের সংবাদ পেয়ে গেলেন যথাসময়ে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইয়াসিনের প্রথম কয়েক আয়াত তেলাওয়াত করে এক মুষ্টি মাটিতে ফুঁ দিলেন। দৃঢ় পায়ে দরজা পেরিয়ে কাফের ঘাতক দলের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কুদরতিভাবে তা সকলের চোখে গিয়ে পড়ল। অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল তারা। আর তাদের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিছুই টের পেল না কাফের দল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা চলে গেলেন প্রিয় দোস্ত হযরত আবূ বকর রাযি. এর গৃহে। বেশ ক'দিন আগে থেকেই হুযূরের ইশারায় হিজরতের আভাস পেয়েছিলেন তিনি। তাই দেরি হলো না। প্রিয় দোস্তকে নিয়ে রাতের আঁধারেই মক্কার অদূরে 'সওর' পর্বতে পৌঁছে গেলেন।

ভোরের স্নিগ্ধ আলো রাতের আঁধারকে দূরীভূত করে দিনের আগমনকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত। ঘাতকদল আরও সতর্ক হয়ে উঠল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজটি করতে ব্যস্ত তারা। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল কে কার আগে হত্যা করবে মুহাম্মাদকে। ঘরে প্রবেশ করে দেখল এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তাদের শিকার। স্বপ্ন পূরণের উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল তারা। কেউ কেউ এই অবস্থাতেই ঘৃণ্য কাজটি সমাধা করতে উদ্যত হলো। তবে অন্যরা বারণ করল। ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে হত্যা করা কাপুরুষোচিত কাজ। তাছাড়া শত্রু যখন হাতের নাগালে, এত ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই।

চাদর ওঠাল একজন। এ কী! বিস্ময়ে হতবাক সবাই। এ যে আবূ তালিবের বেটা আলী! তা হলে মুহাম্মাদ কোথায় গেল! প্রশ্ন ছিল সবার মুখে। কিন্তু উত্তর ছিল না কারো কাছে। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। এ মানবপ্রাচীর ভেদ করে গেল কীভাবে? এক অজানা তিরের আঘাত ক্ষত-বিক্ষত করল সবার হৃদয়-মন।

সংক্ষিপ্ত পরামর্শ, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ল ঘাতকদল। রব পড়ে গেল, মুহাম্মাদ মক্কা হতে পালিয়েছে।

পদচিহ্ন অনুসরণ করে একদল পৌঁছে গেল সওর গুহার নিকটে, যেখানে অবস্থান করছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সফরসঙ্গী আবূ বকর রাযি.। শত্রুরা একটু উঁকি মারলেই দেখে ফেলত আল্লাহর হাবীবকে। কিন্তু আল্লাহর কারিশমা বান্দার বোঝার সাধ্য কোথায়? আল্লাহর রাসূল গুহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর মাকড়সা এসে গুহামুখে জাল বুনে দিল এবং কবুতর নতুন বাসা তৈরি করে পেড়ে

রাখে ডিম। এ দৃশ্য দেখে কাফেররা ধোঁকায় পড়ে গেল। বুঝতেই পারল না তাদের বহু কাঙ্ক্ষিত শিকার এইখানেই অবস্থান করছে। ব্যর্থ মনে ফিরে গেল তারা।

মক্কাব্যাপী একই আলোচনা। একই গুঞ্জন। মুহাম্মাদ গেল কোথায়! এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে গেলইবা কীভাবে? চারদিকে শলা-পরামর্শ। ফিকির-ফন্দি চলতে লাগল। যেভাবেই হোক, বের করতে হবে মুহাম্মাদকে। চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে মুহাম্মাদের মিশন। তাই এবারের পদক্ষেপ হবে আরও ভয়াবহ। আরও ভয়ঙ্কর। চূড়ান্ত হামলা এবার করতে হবে। সর্বসম্মতিক্রমে এটাই হলো তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

কাফেরদের এই ভয়াবহ পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। যথাসময়ে শত্রুদের কর্মসূচি সম্পর্কে খবর রাখা নবীজির খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে সংগ্রহ করবেন তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। এই কঠিন মুহূর্তে এমন ভয়াবহ দায়িত্ব কে আন্‌জাম দিবে?

কাফেররা জানতে পারলে তার পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ। আরও ভয়ঙ্কর। জ্যান্ত ছাড়া হবে না তাকে। তাদের হাতে নির্ঘাত জীবন দিতে হবে। ইসলামের এই কঠিন মুহূর্তে, এ ঝুঁকিপূর্ণ গুরুদায়িত্ব মাথায় নিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নারী। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কন্যা হযরত আসমা রাযি.। তিনি হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের সহধর্মিনী এবং অসম সাহসী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-এর মাতা। ইতিহাসের এই মহীয়সী নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মানসে এগিয়ে এলেন।

হযরত আসমা রাযি. ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও উপস্থিত বুদ্ধিতে সবার সেরা। হিজরতের রাত্রে রাসূল যখন আবূ বকর রাযি.-এর ঘরে এলেন, তখন সবকিছুর নিখুঁত আয়োজন করে দিলেন এই মহীয়সী।

সওর-গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন। এদিকে হযরত আসমা রাযি. দিনভর কাফেরদের মাঝে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে রাতের কোনো এক প্রহরে তা পৌঁছে দিতেন

আল্লাহর রাসূলের নিকট। গুহা-অভ্যন্তরে রাসূলের জন্য সময়মতো খাবারের ব্যবস্থা করতেন তিনিই।

প্রতিদিন অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এ মহান দায়িত্ব আন্জাম দিতেন আসমা রাযি.। কঠিন মুহূর্তে একজন নারীর জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ সাধারণ বিষয় নয়।

অনেক দিন হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. মদীনায় হিজরত করেছেন। বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে প্রিয় রাসূলকে দেখতে পারছেন না তিনি। ভালোবাসার ঢেউ যেন উথলে পড়তে চায়। যাঁকে না দেখলে মুহূর্তও কাটে না তার, সেই প্রিয়তম রাসূলের সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত দীর্ঘদিন ধরে। রাসূলের ভালোবাসায় টইটুম্বুর যাঁদের হৃদয়-মন, সেই প্রিয়তম রাসূলের বিরহ-যাতনা সহ্য করা কীভাবে সম্ভব? হযরত আসমা রাযি.-এর অস্থিরতা ক্রমেই বাড়ছে। কোনো কিছুতেই মন বসছে না তাঁর। এক অনাবিল সুখের পরশের আশায় ব্যাকুল তিনি। কিন্তু তা মক্কায় নেই। আছে সুদূর ইয়াসরিবে। তাই মক্কার অলি-গলি আর ভালো লাগছে না। মন বসছে না মক্কার রুক্ষ রুদ্ধ পরিবেশে। মদীনায় হিজরতের চিন্তা তাঁর মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু কীভাবে পাড়ি দিবেন মদীনার সুদীর্ঘ পথ? তিনি তখন গর্ভবতী। মদীনার দুর্গম-দুস্তর পথ চলার পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেও প্রিয়তম রাসূলের মুহাব্বত ও ঈমানের প্রচণ্ড জোয়ারের সম্মুখে কোনো কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না তাঁর চলার পথে। মদীনার পথে যাত্রা করলেন তিনি। আর সেখানেই জন্ম নিল তাঁর আদরের দুলাল কলিজার টুকরা আবদুল্লাহ রাযি.। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মায়াবী আকর্ষণ। যেন শিশির ভেজা গোলাপের পাঁপড়ি। সাহাবাগণ দারুণ পুলকিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত করা হলো নবজাতক ভবিষ্যতের মহানায়ক, হযরত আবদুল্লাহকে। রাসূল মুচকি হাসলেন। যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিলেন আবদুল্লাহর জন্য। রাসূল থুতু দিলেন আবদুল্লাহর

মুখে। এই থুতুই হলো শিশু আবদুল্লাহর প্রথম খাদ্য, যা তাঁর জন্য ছিল হাউজে কাউসারের মতো। তাই শাহাদাতের পরবর্তী জীবনে তিনি হয়েছিলেন ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-এর শাহাদাতের দাস্তান ছিল বড় লোমহর্ষক। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তাঁর মা আসমা রাযি.-এর ধৈর্যের কাহিনী তাঁর চাইতে অধিক বিস্ময়কর।

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর মিশর, ইরাক, খোরাসান হিজাজসহ সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা তাঁর খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু বনু উমাইয়ার ষড়যন্ত্রকারী কূটনীতিবাজদের তা সহ্য হলো না। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. এর জন্য তারা মহাসঙ্কট হয়ে দাঁড়াল। নানা কূট কৌশলে খিলাফতের সীমানা সঙ্কুচিত করে অবশেষে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে মক্কা অবরোধ করল। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র তখন বায়তুল্লায়। তাঁরা মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে হাজ্জাজের মোকাবেলায় প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। সিরীয় বাহিনী প্রবল বেগে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে লাগল।

নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে বায়তুল্লাহর দেয়াল ফেটে পড়তে লাগল। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রশান্ত মনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। এভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। দীর্ঘ অবরোধের কারণে মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির হয়ে অনেক সেনা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দলে যোগ দিল। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের দুই পুত্র হামজা ও হাবীবও হাজ্জাজ-বাহিনীতে যোগ দিল। সবকিছু উপেক্ষা করে ইবনে যুবায়ের তাঁর সামান্য কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। একসময় মাথায় তিরের আঘাতে তিনি আহত হয়ে পড়লেন। দৃষ্টিসীমার ভেতরে কোথাও আলোর সামান্য ঝিলিক দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে অবশেষে মায়ের কাছে ছুটে এলেন। আম্মাই পারবেন এই চরম মুহূর্তে সঠিক নির্দেশনা দিতে, যিনি জীবনে বহু ঘাত-

প্রতিঘাত সহ্য করে হিমালয়সম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে পরামর্শ।

হযরত আসমা রাযি. এই কঠিন মুহূর্তে কলজে-ছেঁড়া ধনকে যে উপদেশ দিয়েছেন ইতিহাসে তা সত্যিই বিরল ও বিস্ময়কর। অবশ্যই তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।

সালাম বিনিময়ের পর আসমা রাযি. বললেন,

– বাবা! এ কঠিন মুহূর্তে তুমি এখানে কেন? দেখছ না প্রস্তরাঘাতে বায়তুল্লাহর দেয়াল থরথর করে কাঁপছে? তোমার সাথীদের কোথায় ফেলে এলে?

– জানি মা। শুধু আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে এসেছি। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.।

– এ মুহূর্তে পরামর্শ কিসের! আতঙ্কিত আসমা রাযি.-এর কণ্ঠ।

– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কাতর কণ্ঠে বললেন, আম্মা! আপনি জানেন, হাজ্জাজের ভয়ে ও ধন-সম্পদের লোভে আমার বহু সঙ্গী পালিয়ে তার দলে চলে গেছে। এমনকি আমার দুই সন্তানও আমাকে ফেলে চলে গেছে। আমার মুষ্টিমেয় সাথী এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তারাও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আম্মা অপর দিকে বনু উমাইয়ার দূতরা আমাকে অস্ত্র সমর্পণ করে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে বলছে। বিনিময়ে অনেক কিছু দিতে চায় তারা। এ অবস্থায় আমি কী করব? ছেলের এহেন কথায় আবেগময় হয়ে পড়লেন আসমা রাযি.। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

– বাবা, যদি আল্লাহর দীন জমিনে বুলন্দ করার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত জিন্দা করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে থাকো, তাহলে তুমি হক পথে আছ। আর যদি তুমি তোমার আধিপত্য বিস্তারের মানসে এ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে এ ধরাপৃষ্ঠে

তুমিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী। তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এতগুলো প্রাণহানীর জন্য তুমিই দায়ী।

– আম্মা আমার সাথীগণ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে!

– তাতে কী হয়েছে! ধর্মভীরু লোকেরা কারও সহযোগিতা ছাড়াই আল্লাহর পথে লড়ে যায় অবিচল থেকে। তাছাড়া তুমি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় থাকবেই-বা কদিন?

– আম্মা আজকেই আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। তবে ভয় হচ্ছে, হাজ্জাজের লোকেরা আমার চেহারা বিকৃত করে দিবে।

– আত্মসমর্পণের চেয়ে সিংহের মতো লড়ে মরাই ভালো। আর হ্যাঁ, মৃত্যুর পর ছাগলের চামড়া খশানোর দ্বারা ছাগলের কিছু এসে যায় না।

মায়ের এসব কথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-এর তপ্ত হৃদয়ে বৃষ্টির মতো কাজ করল।

স্বর্গীয় দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল নূরানী চেহারায়। হৃদয়ে এক অনাবিল শান্তির পরশ অনুভব করলেন তিনি। আনন্দের আতিশয্যে মায়ের কপাল চুম্বন করে বললেন,

– আম্মা, অনেক অনেক মোবারকবাদ আপনাকে! আমি মোটেই ক্লান্ত হইনি। একমাত্র আল্লাহর পথে আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করছি। বাতিলের বিষদাঁত চূর্ণ করার মানসেই এই মরণযুদ্ধে জড়িয়েছি। দুনিয়ার মোহে পড়ে আমি লড়িনি। আম্মা, আমার জন্য দুআ করবেন। আমার শাহাদাতে ব্যথিত হবেন না।

– আমি দুঃখ পেতাম যদি তুমি পলায়ন করে জীবন দিতে। বললেন মহীয়সী মা।

– আম্মা, আপনার ছেলে কোনো অপকর্মের সিদ্ধান্ত নেয়নি। কারও সঙ্গে অসদাচরণ করেনি কখনো। কখনো কুরআনের বিধান লঙ্ঘন করেনি। ইসলামের নিরাপত্তায় বিশ্বাসঘাতকতাও করেনি। আম্মা, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমি সত্য পথে আছি।

হযরত আসমা রাযি.-এর মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবেগাপ্লুত হয়ে ছেলের মাথায় হাত রাখলেন এবং সারা দেহে হাত বুলিয়ে দিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। যেন বিষাক্ত কিছুর উপর হাত পড়েছে। বললেন,

– একী! তুমি এটা কী পরেছ?

– বর্ম, মা!

– আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত কামনাকারীর জন্য এটা শোভন নয়।

– শুধু সান্ত্বনার জন্য এটা পরিধান করেছি আম্মা!

– না, তার প্রয়োজন নেই। ওটা খুলে ফেলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বর্ম খুলে ফেলে বললেন,

– আম্মা, আপনি আমার জন্য একটু দুআ করুন...

অশ্রুসজল চোখে তাকালেন মা শহীদী ঈদগাহের ইমামের দিকে। তারপর আকাশের দিকে দুই হাত উঁচিয়ে ধরলেন। হে আল্লাহ! তোমার দীনকে বুলন্দ করার জন্য আবদুল্লাহ তোমার রাহে শহীদ হতে যাচ্ছে। তুমি তার শাহাদাত কবুল করো। হে আল্লাহ! আমি তাকে তোমার হাতে অর্পণ করলাম। আর তোমার ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট। আমাকে ধৈর্যশীলদের কাতারে শামিল করে নাও।

মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. ছুটে চললেন রণাঙ্গনে। শত্রু-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বীরবিক্রমে জিহাদ করে শত্রু-বাহিনীর বেষ্টনির ভেতর চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রণাঙ্গন আবার কেঁপে উঠল। কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কারণ শত্রুদের নিকট তিনি ও তার সাথীরা ছিলেন মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নৌকার মতো। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে তা বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.।

ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় আজও তাঁর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধগাঁথা বর্ণনা করে গর্ববোধ করে। যুগের বীর সেনানীদের আলোকময় দিক-নির্দেশনা দান করে।

শাহাদাতের পর হাজ্জাজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর মস্তক কর্তন করে আবদুল মালেকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। আর তাঁর মস্তকবিহীন দেহ মক্কার বাইরে এক উঁচু স্থানে ঝুলিয়ে রাখে।

একজন মা সন্তানের এই মর্মান্তিক দৃশ্য কীভাবে সহ্য করেছেন কলমের ভাষায় তা ব্যক্ত করা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে খবর পাঠালেন, আবদুল্লাহর দেহ শূলি থেকে নামিয়ে কোনো এক জায়গায় সমাহিত করার জন্য। কিন্তু পাষণ্ড হাজ্জাজ এই মহীয়সী মায়ের সামান্য আবদারটুকু রাখল না।

মক্কার লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. এর লাশের পাশ দিয়ে গমন করতেন আর সেদিকে তাকিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরাতেন।

ঘটনাক্রমে হযরত আসমা রাযি. একবার তাঁর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় অপলক নেত্রে ছেলের লাশের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখের অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে দিলেন। কলজে-পোড়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। এর কয়েকদিন পরই তিনি এই নশ্বর পৃথিবীকে আলবিদা জানিয়ে চলে গেলেন পরপারে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল একশ বছর। দীর্ঘ এই বর্ণাঢ্য জীবনে রেখে গেছেন অনেক ত্যাগ। হাজারো প্রতিকূলতার মাঝে যেখানে বীর পুরুষেরাও দাঁড়াতে অক্ষম ছিল, সেইখানে এই মহীয়সী নারী দাঁড়িয়েছিলেন দৃঢ়পদে, শির উঁচু করে। ইতিহাসের পাতায় এর নজির পাওয়া দুষ্কর।

শহীদ স্বামীর পাশে একজন বীর নারী

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. এর খেলাফতকাল। চারদিকে ইসলামের জয়জয়কার। মুসলমানদের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে বিশ্বের সমস্ত তাগুতি শক্তি। বিভিন্ন ভূখণ্ড পেরিয়ে মুজাহিদরা পৌঁছে গেছে রোম পারস্যের সীমানা ছাড়িয়ে। একের পর এক লড়াইয়ে তাগুতি শক্তিগুলোকে দুপায়ে দলে সামনে অগ্রসর হচ্ছে মুসলিমবাহিনী। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ লড়ছে তারা। এ অসীম যুদ্ধে শুধু যে পুরুষদের ভূমিকা ছিল তা নয়, বিভিন্ন সময় নারীরাও প্রাণপণ লড়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে। শক্তি, সাহস, বুদ্ধি দিয়ে পুরুষদের ডান হাত হয়ে ময়দানে কাজ করেছে তারা। এমনি এক নারী হযরত আবান বিন সাঈদের বীরাঙ্গনা স্ত্রীর বীরত্বগাথা এখানে আলোচনা করছি।

মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার হযরত আবূ উবায়দা রাযি.। তিনি তাঁর সাথীদের যুদ্ধের নির্দেশ দেন। অপরদিকে কাফের বাহিনীর কমান্ডার (প্রকৃত নাম নয়) টমা গেটের কাছে এলো। সে ছিল বড় সাধু প্রকৃতির লোক। রোমানদের মধ্যে টমার চেয়ে বড় কোনো আবেদ-জাহেদ ছিল না। এ কারণে রোমানরা তাকে অত্যন্ত সম্মান করত। তার কথায় জান উৎসর্গ করতে পারাকে তারা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করত।

টমা তার প্রাসাদ থেকে বের হয়। মাথায় শোভা পাচ্ছে একটি ক্রুশ। সে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়ালো। তার চারপাশে বড় বড় সেনা কর্মকর্তাও দাঁড়িয়ে। কিছু লোক ইঞ্জিল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। টমা ইঞ্জিলের পাতায় হাত রেখে বলল,

'হে আল্লাহ! আমরা যদি সত্যের উপর থাকি, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করুন। শত্রুদের হাতে আমাদেরকে তুলে দেবেন না। আমাদের মধ্যে যে অন্যায়কারী তাকে আপনি সাহায্য করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি

তার ব্যাপারে অবগত। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ক্রুশ এবং যে তার ধর্মে অটল তার অসিলায় আপনার নৈকট্য কামনা করছি। আপনি আমাদেরকে অলৌকিক ও ঐশী নিদর্শন দেখান। আমাদেরকে এ জালিমদের উপর সাহায্য করুন।'

সেনাসদস্যরা টমার এসব কথা শুনে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী ও আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। হযরত কায়েস রাযি., কাতেবে অহী শুরাহবিল বিন হাসানার নেতৃত্বে টমা গেটে যুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, টমাসহ রোমানদের কথাবার্তা ভাষান্তর করে দিতেন বসরার ইসলাম গ্রহণকারী শাসক রুমাস। হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার নিকট টমার এসব কথাবার্তা কেমন যেন লাগল, তাই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন,

'ওহে অভিশপ্ত, তুমি মিথ্যা বলছ, আল্লাহর নিকট ঈসার তুলনা আদমের ন্যায়, তাঁকে তিনি মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে তিনি যতদিন ইচ্ছা জীবিত রাখলেন এবং যখন ইচ্ছা আকাশে তুলে নিলেন।'

তারপর রুমাস টমার দিকে তির নিক্ষেপ করেন। তখন টমা তীব্র যুদ্ধ শুরু করে দেয়। সে পাথর ছুড়ে মুসলিম সেনাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিল এবং তিরের আঘাতে কিছু মুসলমানকে আহত করতে সক্ষম হলো। আহতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত আবান বিন সাইদ ইবনুল আস রাযি.। বিষাক্ত তিরের আঘাতে তিনি ছটফট করছিলেন। সাথীরা তাঁকে ধরাধরি করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তারা তাঁর পাগড়িটি খুলে ফেলতে চাইল। তিনি বললেন, আমার পাগড়ি খুলবেন না। পাগড়ি খুললে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আমি যা চেয়েছি মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে তা দান করেছেন। কিন্তু সাথীরা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর পাগড়ি খুলে ফেলল। পাগড়ি খোলার পর তিনি আকাশের দিকে ইশারা করে বললেন,

أَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُه هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং রাসূল। এটা সে বস্তু, যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। রাসূলগণ সত্য বলেছেন।

এ কথা বলতেই তাঁর রুহ নশ্বর এ পৃথিবী ছেড়ে প্রভুর নিকট চলে যায়। হযরত আবান রাযি.-এর স্ত্রী ছিলেন তাঁর চাচাতো বোন। কিছুদিন পূর্বে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের সময় তাঁর হাতে লাগানো মেহেদি ও মাথায় লাগানো আতরের সুগন্ধি এখনো বের হচ্ছে। তিনি সাহসী ও বীর পরিবারের কন্যা ছিলেন। যখন তিনি স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনলেন, তখনই স্বামীর লাশের পাশে চলে এলেন। তিনি হা-হুতাশ করেননি, বরং ধৈর্যধারণ করেছেন। এ সময় তার জবান থেকে শুধু এ কথাটিই বের হয়েছে—

আমাকে যা দান করা হয়েছে, তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট এবং আপনি আপনার প্রভুর নিকট চলে গেলেন, যিনি আমাদের দু'জনের মাঝে মিলন ঘটিয়েছিলেন। তারপর তিনি আমাদের দু'জনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটালেন। আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করে যাব। আমি আপনার প্রতি অনুরাগী, আপনার পর কারও পক্ষে আমাকে স্পর্শ করা জায়েজ হবে না। আমি নিজেকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছি। হতে পারে আপনার সঙ্গে শিগ্‌গিরই মিলিত হব।'

হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি. হযরত আবান বিন সাঈদের জানাজা পড়ালেন। তাঁকে দাফন করে তাঁর স্ত্রী কালবিলম্ব না করে স্বামীর অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন এবং হযরত খালেদ বিন ওলিদ রাযি.-কে না-জানিয়েই যুদ্ধরত মুজাহিদদের সঙ্গে মিশে গেলেন। প্রথমে তিনি জানতে চান, তাঁর স্বামী কোন্ গেটে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁরা বললেন, টমা গেটে। তাঁকে শহীদ করে সম্রাটের মেয়ে-জামাই টমা। তখন তিনি টমা গেটে হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার নেতৃত্বাধীন মুজাহিদদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা রাযি. বলেন, দামেস্ক অবরোধ

করার সময় টমা গেটের উপর ক্রুশ হাতে একজন লোক দেখেছিলাম। সে ছিল টমার গাইড। সে বলেছিল,

'হে আল্লাহ! এ ক্রুশ এবং যে এর আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য ক্রুশের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।'

আমি তাঁর দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ আবানের স্ত্রী তার দিকে একটি তির নিক্ষেপ করলেন। তির তার হাতে লাগল। ফলে তার হাত থেকে মুক্তাখচিত ক্রুশটি পড়ে গিয়ে আমাদের দিকে গড়াগড়ি দিয়ে চলে আসে। তখন আমাদের কিছু সাথী ক্রুশটি তুলে নেওয়ার জন্য দৌড়ে যায়। ক্রুশটি কে কার আগে তুলে নেবে সে ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

আল্লাহর দুশমন টমা তাদের ক্রুশ নিয়ে মুসলমানদের এ টানা-হেঁচড়া দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলো। বলল, সম্রাটের কাছে এ খবর পৌছে যাবে যে, আরবরা আমাদের কাছ থেকে ক্রুশ ছিনিয়ে নিয়েছে। এটা কখনও হতে পারে না। এ বলে সে তরবারি হাতে মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসতে চাইল এবং বলল, তোমাদের যার মন চায় আমার সঙ্গে এসো। আর যার মন চায় থাকো। যেভাবেই হোক এদের সঙ্গে আমার মোকাবেলা করতেই হবে। গেট খোলার নির্দেশ দিয়ে সে বাইরে চলে আসে, তার পেছনে পেছনে রোমান সেনারাও পঙ্গপালের ন্যায় ধেয়ে এলো।

এদিকে মুসলমানরা ক্রুশটিকে ঘিরে রেখেছিল। রোমানদের বের হতে দেখে মুসলিম সৈন্যরা ক্রুশটি হযরত শুরাহবিল রাযি.-এর নিকট হস্তান্তর করে। রোমানরা এসে মুসলমানদের উপর তির ও পাথর বর্ষণ শুরু করে। তাদের কিছু লোক দেয়ালের উপর থেকে, ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তির ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে। তখন হযরত শুরাহবিল রাযি. ডাক দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ! আপনারা গেটের উপর দাঁড়ানো আল্লাহর শত্রুদের তির থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একটু পেছনে চলে যান। লোকজন নির্দেশ পালন করল। টমা তাদের দিকে

এগিয়ে যায়। সে ডানে বামে যাকে পাচ্ছে তির ছুড়ছে। তার সঙ্গে রয়েছে কিছু বীর সেনা। হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা এ অবস্থা দেখে চিৎকার করে বললেন,

'হে লোক সকল! আপনারা জান্নাতের সন্ধানে মৃত্যুর কথা ভুলে যান এবং নিজেদের কর্ম দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করুন। তিনি আপনাদের পলায়ন ও পিছুটান পছন্দ করেন না। অতএব আপনারা কাছে গিয়ে তাদের উপর হামলা করুন। আল্লাহ আপনাদের কাজে বরকত দিন।'

হযরত শুরাহবিলের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শুনে মুসলিম সৈন্যরা তির-তরবারি নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে দামেস্কের লোকজন জানতে পারল যে, টমা তার গেট দিয়ে বেরিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং তার ক্রুশটি মুসলমানরা নিয়ে গেছে। তখন তারা তার দিকে দৌড়ে এলো। টমা ক্রুশের সন্ধানে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার প্রতি পড়ল। তাঁর হাতে ক্রুশ দেখে সে আর ধৈর্যধারণ করতে পারল না। চিৎকার দিয়ে বলল, ক্রুশ দিয়ে দাও। তোমার মায়ের মৃত্যু হোক।

হযরত শুরাহবিল রাযি. আল্লাহর দুশমন টমাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ক্রুশ হাত থেকে ফেলে তার দিকে ছুটে যান। আবানের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কে? বলা হলো, সে সম্রাটের মেয়ে-জামাই এবং আপনার স্বামীর ঘাতক টমা, তখন তিনি ক্রুশ তুলে নেন। হযরত আবান রাযি.-এর স্ত্রী লোকদের বললেন, তার প্রতি তির নিক্ষেপ করুন। তিরটা টমার ডান চোখে বিদ্ধ হয়। সে হযরত শুরাহবিলের কাছ থেকে সরে যায়। কিন্তু হযরত আবানের স্ত্রী তার দিকে দৌড়ে যান। তিনি টমার দিকে আরও তির ছুড়তে চাইলেন। কিন্তু টমার সাথীরা তাকে ঢাল দিয়ে রক্ষা করে। এ সময় কিছু মুসলিম সৈন্য হযরত আবানের স্ত্রীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। হযরত আবানের স্ত্রী তির ছুড়েই চলছেন। তাঁর তির একজন শত্রুর গায়ে বিধল। সে ছিল অত্যন্ত মোটা এবং সে-ই সবার আগে পালানোর চেষ্টা চালায়। তির খেয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়।

তারপর মারাত্মকভাবে টমার আহত হওয়া এবং তাদের মহা ক্রুশ মুসলমানদের হাতে এসে যাওয়ায় তাদের মনোবল একেবারে ভেঙে যায়। এরপর দফায় দফায় যুদ্ধ হলেও আগের সেই শৌর্য-বীর্য ছিল না তাদের। তারপর টমা তার সাথীবর্গসহ আত্মসমর্পণ করল। এভাবেই একটি শক্তিশালী দূর্গ মুসলমানদের পদানত হলো।

কোথায় পাব এমন জননী?

মরুপ্রান্তর। ধূসর মরুসাগর। দৃষ্টিসীমার শেষ পর্যন্ত বালি আর বালি। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উপল খণ্ড। দুপুরের প্রখর রোদে বালুকণাগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে দাপাদাপি করে। আবার বিকেলের স্নিগ্ধ শীতলতায় অপূর্ব হিমেল বায়ুপ্রবাহ ছুটে বেড়ায়। এই তাপদগ্ধ ও স্নিগ্ধ শীতলতার মাঝে ছোট একটি নগরীর নাম ইয়াসরিব। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হিজরত করে আসার পর একে মদীনাতুর রাসূল বলা হয়। খেজুর বৃক্ষের সবুজ প্রান্তরের মাথায় বহুকষ্টে, বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

দূর আকাশে অনুপম চাঁদ মিটিমিটি জ্বলছে। মুখে নিটোল হাসি। নিঝুম নিস্তব্ধ রজনী। ঊর্ধ্বলোকের বাতায়ন খুলে তারকারাজি মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে আছে। শুধু মেঘমালা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে অজানা লোকে। স্বর্গীয় স্নিগ্ধ সুষমায় সিক্ত মদীনা নগরী তখন ঘুমে অচেতন। ক্রমে রাত গড়িয়ে সুবহে সাদেক হলো। আলোকচ্ছটায় পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অপসৃয়মান অন্ধকারের বুক চিরে একটি কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল মদীনার অলিতে-গলিতে।

হাইয়্যা আলাল জিহাদ। হে মুজাহিদেরা! হে রাসূলের সাহাবারা! ইসলাম আজ উষ্ণ রক্তে ধন্য হতে যাচ্ছে। ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে স্তব্ধ করতে সমবেত হয়েছে। তোমরা জিহাদে চলো।

হযরত বেলাল রাযি.-এর ডাকে অচেতন মদীনা শিউরে উঠল। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

পথের বাঁকে এক জীর্ণ কুঠিরে এক বিধবা মহিলা তার ছোট্ট পুত্রসন্তানকে বুকে জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। হযরত বেলাল রাযি.-এর কণ্ঠস্বরে তাঁর ঘুম ভেঙেছিল। জিহাদের ডাক! হৃদয়টা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অশ্রুতে চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এলো। মানসপটে ভেসে উঠল প্রিয়তম স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত অন্তিম মুহূর্তগুলো যখন শানিত তরবারি তুলে দিচ্ছিলেন স্বামীর হাতে। তারপর অশ্বের পদাঘাতে ধূলিঝড় উড়িয়ে তিনি চিরবিদায় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বদর অভিমুখে।

কিন্তু তারপর? তারপর ফিরে আসছিলেন শহীদের খুনরাঙা আবরণে। অধরে লেগে ছিল অপূর্ব একফালি জান্নাতি হাসির রেখা। রক্তে জান্নাতি খোশবু। তিনি আজ বহুদূরে, জান্নাতের মনোরম উদ্যানে। কিন্তু আমি? আমি হতভাগিনী রয়ে গেলাম। চির দুঃখিনী আমি। কল্পনার অসহ্য যাতনায় অশ্রু ঝরতে লাগল অঝোর ধারায়। ডুকরে কেঁদে উঠল বিধবা। অশ্রুর উষ্ণ পরশে, কান্নার ক্ষীণ আওয়াজে এতিম বালকটির ঘুম ভেঙে গেল। হতবিহ্বল হয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। মায়ের মুখের দিকে সে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল, মা, কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার? আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। ওষ্ঠধর কাঁপতে লাগল। শত চেষ্টা করে আর কিছু বলতে পারল না এতিম বালকটি।

ছেলের কপালে মা তাঁর গভীর মমতার আবেশে চুম্বনরেখা এঁকে দিলেন। পরম স্নেহে ছেলের চুল নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, বাবা! আজ ইসলামের বড় দুর্দিন। জিহাদের ডাক এসেছে। তোর আব্বা থাকলে তাঁকে জিহাদে পাঠাতাম। তিনি নেই। তুমিও ছোট। কাকে রাসূলুল্লাহর সাথী করে জিহাদে পাঠাব?

বালকপুত্র শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, মা আপনি কাঁদবেন না। আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে চলুন। তিনি যদি আমাকে জিহাদে কবুল করে নেন তবে তো মহাসৌভাগ্য। এখনই চলুন।

ছেলের কথায় মায়ের অবারিত কপাট খুলে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া প্রবেশ করল। বিধবা দারুণ আনন্দিত হলেন ছেলের কথায়। চুমুতে চুমুতে ভরে দিলেন ছেলের সারাদেহ। তারপর অপলক তাকিয়ে রইলেন প্রিয় কলিজার টুকরার দিকে।

ফজর নামাযের পর মসজিদ-চত্বরে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো। সারিবদ্ধ প্রবীণ মুজাহিদদের সঙ্গে নবীন মুজাহিদের দল এসেও উপস্থিত। চোখে-মুখে আনন্দের ফল্গুধারা। বুকে অসীম সাহস, হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত উল্লাস, আর প্রশান্তি। খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সেনাপতি। আল্লাহ তাদের পরিচালক। সুতরাং বিজয় তো তাদেরই।

একটু পর ভরমজমায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন। কিশোর মুজাহিদদের তিনি আদরে সোহাগে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এমন সময় বিধবা মহিলাটি তার ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি আশা-নিরাশার দোলায় দুলছেন। আলো আঁধারে এক অপূর্ব মিলন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার মুখাবয়বে।

আবেগমাখা কণ্ঠে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ছেলেটি আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। আমার দ্বিতীয় কোনো সন্তান নেই। ওর পিতা আপনার সঙ্গে বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাই আপনার দরবারে আমার আবেদন, দয়া করে ওকে জিহাদে কবুল করে নিন। এর বদৌলতে আমি কেয়ামতের দিন মুজাহিদ মায়েদের সঙ্গে দাঁড়াতে চাই।

আবেগদীপ্ত চেতনায় উদ্দীপিত মহিলার কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশি হলেন। মুগ্ধ হলেন উপস্থিত সাহাবাগণও। শহীদ পিতার কথা শুনে আবেগাকুল হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলেন। আদরে ভরে দিলেন তাকে। পরম স্নেহে বললেন, তুমি এখন কিশোর। আর একটু বড় হও। তখন তোমাকে জিহাদে নিব, কেমন?

ছেলেটি তখন করুণ আবেদনের সুরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আম্মা যখন চুলোয় আগুন ধরান তখন দেখি ছোট-ছোট খড়িগুলোই চুলোয় আগে দেন। আমিও কি জিহাদের ময়দানে ছোট খড়ি হতে পারি না? ছেলেটির অপূর্ব বুদ্ধিমত্তায় দারুণ বিস্মিত হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির নিষ্পাপ মুখের দিকে। তারপর একরাশ প্রশান্তিতে ভরে উঠল তাঁর চোখের মণি। আনন্দে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে বললেন, হে ভাগ্যবতী নারী! আল্লাহ তোমার ছেলেকে কবুল করেছেন। তোমার প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি কেয়ামতের দিবসে মুজাহিদের মায়েদের সঙ্গেই থাকবে!

নবীপ্রেমে পাগলপারা এক নারী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করায় অহুদযুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। সত্য দীনের আহ্বানে জিহাদের প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত রাখতে তাঁদের সর্বদা উদ্বুদ্ধ করেছে। শত বিপদ, বালা-মুসিবত, শত বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে তাঁরা লাভ করেছেন জীবনে পূর্ণতা। অহুদের যুদ্ধ নবীন মুজাহিদদের এই সুযোগ দান করেছিল।

মুসলমানদের এই প্রাণদান ব্যর্থ হয়নি। বৃথা যায়নি। সে ছিল এক পরম পরীক্ষার দিন! সংবাদ রটে গেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত বরণ করেছেন। এ মহা দুঃসংবাদে অনেক মুজাহিদ ভেঙে পড়লেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন অনেকেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বেঁচে নেই তাহলে আর যুদ্ধ করে লাভ কী? যুদ্ধ করব কার জন্য? এ ভাবনা ছিল অনেকেরই।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে দৃঢ় করে দিলেন। আবার দুর্বার গতিতে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ফলে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত জয় মুসলমানেরই পদচুম্বন করল। যদিও ক্ষয়-ক্ষতি মুসলমানদের বেশি হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ শুনে মদীনার এক আনসার রমনি পাগলপারা হয়ে ছুটছেন অহুদের প্রান্তরে। উদ্দেশ্য, সঠিক সংবাদ জানা।

পথেই পড়ল একজন যুদ্ধ-ফেরত সাহাবী। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ কী? তিনি কেমন আছেন? জলদি বলো!

সাহাবীর জানা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদে আছেন। তাই সে তার প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে উত্তর দিল, তোমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন।

নিজেকে সংযত রেখে মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ বলো? তিনি জীবিত আছেন কি না?

লোকটি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, তোমার ভাই তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন।

বিচলিত কণ্ঠে মহিলার সেই একই প্রশ্ন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? এবারও লোকটি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, তোমার স্বামীও এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন।

এবার মহিলাটি বিরক্ত হয়ে রাগত স্বরে বললেন, আমার পিতা, ভাই, স্বামী শাহাদাত বরণ করেছেন কি না তা তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি। তুমি দয়া করে আমাকে বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তখন লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত এবং নিরাপদেই আছেন।

মুহূর্তে তার চিন্তিত মুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে উঠল। উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, পিতা, ভাই ও স্বামীর আত্মদান তবে বৃথা যায়নি। ব্যর্থ হয়নি। তাঁরা মরেও লাভ করেছেন অনন্ত জীবন।

কেননা একটি উৎসর্গীত জীবন সত্যের আলো ও আহ্বানকে আরো তীব্রতর, আরো জ্যোতির্ময় করে তোলে।

ইসলামের প্রথম যুগে একদল বিশ্বাসী ও নির্ভীক মুসলমান সকল বাঁধা-বিপত্তি ও মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ মনে করেছিল বলেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে। শান্তির বাণী পৃথিবীময় প্রচারিত হয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এই শান্তির বাণীর বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

হযরত হিন্দা এখন রণাঙ্গনে

বিখ্যাত কুরাইশ-নেতা উতবা বিন রাবিয়ার কন্যা হযরত হিন্দা। তার প্রথম বিবাহ হয়েছিল ফাতাহ বিন মুগিরার সঙ্গে। এ বিবাহ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই পারস্পরিক কলহের দরুন সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরবর্তী বিবাহ হয় প্রসিদ্ধ কোরেশ-দলপতি আবূ সুফিয়ান রাযি.-এর সঙ্গে।

মরু-আরবে ইসলামের সূচনাকালে হযরত হিন্দা রাযি.। তার পিতা ও স্বামী ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম সারির দুশমন। 'মুহাম্মাদ' নাম শুনলেই জ্বলে উঠত তাদের দেহ-মন।

দ্বিতীয় হিজরীতে ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বপ্রথম যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মহা বিজয় ঘটে। ভেঙে যায় কুরাইশ-বাহিনীর কোমর। নিহত হয় তাদের বহু নেতাকর্মী। এদের মধ্যে ছিল ইসলামের প্রধান শত্রু আবূ জাহল। ছিল হিন্দার পিতা উতবাও। তাকে হত্যা করেছিল হযরত হামযা রাযি.।

উতবা নিহত হওয়ার পর আবূ সুফিয়ান তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং কাফের-গোষ্ঠীর পরবর্তী যুদ্ধগুলো তার নেতৃত্বেই সঙ্ঘটিত হয়। বিশেষভাবে অহুদ যুদ্ধ তারই আবেগপূর্ণ প্রতিশোধের ফল।

এই যুদ্ধে বিশেষভাবে শরীক ছিল তার স্ত্রী হিন্দা। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল এই হিন্দা। এই উদ্দেশ্যে যোবাইর বিন মুতয়িমের গোলাম ওয়াহশিকে আগে থেকেই প্রস্তুত রেখেছিল। কারণ ওয়াহশি ছিল নেজা নিক্ষেপে খুবই পারদর্শী।

শুরু হলো যুদ্ধ। ঐতিহাসিক অহুদযুদ্ধ। হক-বাতিলের যুদ্ধ। দুনিয়া থেকে ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে মক্কার কাফেররা কোমর

বেঁধে মাঠে নেমেছে আজ। এদিকে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদরাও বসে নেই। সংখ্যায় তারা অতি নগণ্য হলেও আবেগ-উচ্ছ্বাসের এতটুকু কমতি নেই।

যুদ্ধের ময়দানে পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে আছে ওয়াহশি। তার একমাত্র টার্গেট হিন্দার পিতার হত্যাকারী হযরত হামযা রাযি.।

হযরত হামযা রাযি. যখন তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সুবর্ণ সুযোগই খুঁজছিল ওয়াহশি। হযরত হামযা রাযি. সম্মুখে এগিয়ে গেলে ঠিক তখনই একটি বিষাক্ত নেজা কোমর ভেদ করে যায় তাঁর।

হযরত হামযার শাহাদাতের সংবাদ শুনে হিন্দার সঙ্গীরা আনন্দে গান গাইতে শুরু করে। প্রতিশোধ স্পৃহায় হযরত হামযা রাযি.-এর বুকচিরে কলিজা বের করে আনে হিন্দা এবং তারপর তা চিবোতে থাকে। কিন্তু গলাধঃকরণ করতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে উগরে ফেলতে হয়।

এ দুঃখজনক সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হন। হযরত হামযা রাযি.-এর লাশ দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। বুক চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসে। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারোর মৃত্যুতে এত জোরে কাঁদেননি।

এরপর অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কালের আবর্তে অষ্টম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করে নেন। দশ হাজার আত্মত্যাগী সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। আজ এমন কোনো শক্তি নেই যে এই মহান বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াবে। মুসলমানদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ নেই আজ। প্রতিশোধ নিলে ঠেকানোর কেউ নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন পরম উদার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জীবন শত্রুদের এভাবে ক্ষমা করার উপমা পৃথিবী কখনও দেখেনি। মানব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন তিনি।

হযরত আবূ সুফিয়ান রাযি. মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন তিনি। হিন্দার নিকটও ইসলামের সত্যতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি কয়েকজন সত্যান্বেষিণী মহিলার সঙ্গে বোরকা আবৃত হয়ে দরবারে রেসালাতে হাজির হয়ে গেলেন।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমায়িক মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম কবুল করলেন হিন্দা। সেদিন থেকে হিন্দা হলেন রাযিয়াল্লাহু আনহা।

তখন তিনি হৃদয়ের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন, ইতিপূর্বে কুফুরি অবস্থায় আপনার চেয়ে অধিক ঘৃণিত দুশমন আমার কেউ ছিল না। আর আজ আমার মনে হচ্ছে আপনার চেয়ে পরম প্রিয় দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। তিনি আবেগ আর চেপে রাখতে পারলেন না। বাধভাঙা জোয়ারের ন্যায় তার অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এরচেয়ে মূল্যবান কিছু দরবারে রেসালাতে দেওয়ার মতো আপাতত তার কাছে নেই।

এরপর ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকতেই মূর্তিগুলো সামনে পড়ল তার। ঈমানী জোশ খেলে গেল পুরো তনুমনে। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। আজ সবচেয়ে বড় শত্রু তাকেই মনে হলো। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার পর হযরত হিন্দা রাযি. নিজের জীবনকে সর্বাত্মকভাবে ইসলামের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।

হযরত ওমর রাযি.-এর শাসনামলে সিরিয়ায় অভিযানকারী মুজাহিদদের সঙ্গে তিনি নিজের স্বামীসহ শরীক হলেন এবং এ যুদ্ধে উভয়েই অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে আবেগাপ্লুত হয়ে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করলেন, যা মূলত ইসলাম কবুলের পূর্বে ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার কাফফারা।

সিরিয়ায় সঙ্ঘটিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে ইয়ারমুকের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ যুদ্ধে রোমসম্রাট তার সকল

শক্তি প্রয়োগ করে। এ প্রসিদ্ধ যুদ্ধেও হিন্দা রাযি. ও আবূ সুফিয়ান রাযি. অত্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। কখনো যদি শত্রুদের প্রচণ্ড হামলায় মুসলিমবাহিনীর পিছুটান অবস্থা হত, তখন বীরাঙ্গনা মুসলিম রমণীগণ তাঁবুর খুঁটি বা পাথর উঠিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করত। হযরত হিন্দা রাযি. তখন যুদ্ধের গান গেয়ে মুজাহিদদের উত্তেজিত ও উজ্জীবিত করে তুলতেন। যার দ্বারা মুসলিম বাহিনী হারানো হিম্মত ফিরে পেত।

এমনই এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর স্বামী আবূ সুফিয়ানকে পিছুটান হতে দেখলে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর দীনের বিরোধিতায় এবং আল্লাহর হাবীবের মোকাবেলায় বড় বাহাদুর ছিলে। তাই আজ সুযোগ এসেছে প্রায়শ্চিত্ত করার। সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক দীনের বিজয়ের জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করে মহান প্রভুর প্রিয় হয়ে যাও। আর মনে রেখো, সুযোগ কিন্তু সব সময় আসে না।

কথাগুলো হযরত আবূ সুফিয়ানের আত্মসম্মানে আঘাত হানল এবং তাঁর ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠল। এরপর তিনি অত্যন্ত বীরবিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনলেন।

এ যুদ্ধে এক সুযোগে রোমবাহিনী মুসলিম মহিলা শিবিরের সন্নিকটে এসে যায়। তখন মুসলিম মহিলাগণ তাদের উপর সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করে তাদেরকে হটিয়ে দেয় এবং অনেককে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। এসব বীরাঙ্গনা মহিলার মধ্যে হযরত হিন্দাসহ উম্মে আবান, উম্মে হাকিম ও খাওলা বিনতে আজওয়ারও শামিল ছিলেন।

হযরত হিন্দা ছিলেন আত্মসম্মানী, বিশ্বাসী, জ্ঞানী এবং অত্যন্ত উদারচিত্তের অধিকারিণী। সন্তানদের মধ্যে হযরত আমির মুয়াবিয়া রাযি. ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামলে এই মহান বীরাঙ্গনা আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

কল্যাণকামী আরেক জননী

ইমাম রাবিয়া আর-রায় ছিলেন জ্ঞানের আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভা। এক হীরক খণ্ড।

তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল সীমাহীন। তাবেঈ ইমামদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন গঠনে তাঁর মাতা উম্মে রাবিয়ার অবদান কেবল অনন্য ও অতুলনীয়ই নয় বরং তা ছিল সীমাহীন বিস্ময়কর ও প্রেরণাদীপ্ত এক উপাখ্যান।

৫১ হিজরীর কথা। তখন ছিল মুসলিম ইতিহাসের এক গৌরবময় সোনালি অধ্যায়। মুসলমানদের বিজয়ী অশ্ব যুগ-যুগান্তরে নির্যাতিত মানবতাকেই সংবাদ দিচ্ছিল আলো ঝলমল নতুন দিগন্তের। মূর্তিপূজার আঁধারে নিমজ্জিত বনি আদমকে শেখাচ্ছিল চিরন্তন শাশ্বত আকীদা-বিশ্বাস। যুগ-যুগান্তরের প্রতিমা পূজারী মানুষেরা নত হচ্ছিল মহান আল্লাহ পাকের সামনে। পূর্ব দিকে তখন এ বিজয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মহান সাহাবী রাবী বিন জিয়াদ হারেসি রাযি.। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর দুঃসাহসী ও বিশ্বাসী গোলাম ফররুখ। রাবী রাযি. তখন উপনীত হয়েছিলেন জীবনের শেষপ্রান্তে। সিজিস্তান ও তার আশপাশের এলাকা জয় করার পর তিনি ইসলামের বিজয় নিশানকে জায়হুন নদীর ওপারে বয়ে নিয়ে যেতে সংকল্প করেছিলেন। এ ছিল তাঁর জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা। তাঁর এ মহান স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট দিনে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের ময়দানে ফররুখের বীরত্ব ও সাহসিকতায় রাবী রাযি. মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করেন। এরপর তিনি যুদ্ধের ময়দানে

অনুপম বীরত্বের স্বাক্ষর রাখার জন্য ফররুখকে পুরস্কৃত করেন। তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন এবং গনিমতের অংশ ছাড়াও নিজের পক্ষ থেকে আরও বেশি দান করেন।

এর কিছুদিন পরই মহান সিপাহসালার রাবী ইবনে জিয়াদ হারেসি রাযি. আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দেন। ফররুখ চলে আসেন মদীনায়। তাঁর বয়স তখন ত্রিশের কোটা পেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রাণচঞ্চল ও পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী এক তরুণ। মদীনায় তিনি একটি বড় বাড়ি ক্রয় করেন। একজন বুদ্ধিমতী ও গুণবতী নারীকে বিবাহ করেন। বসবাস শুরু করেন একটি সুখের নীড়ে এবং স্ত্রীর সান্নিধ্যে তিনি খুঁজে পান জীবনের সজীবতা ও আনন্দের ঐশ্বর্য্য। কিন্তু তাঁর মন সর্বদা পড়ে থাকত জিহাদের ময়দানে। এক জুমার দিন তিনি মসজিদের খতিবকে জিহাদের জন্য লোকেদের উৎসাহিত করতে শুনলেন। শুনে ফররুখ মুজাহিদদের সঙ্গে শামিল হওয়ার সংকল্প করলেন। বললেন, আমি তোমাকে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে যাচ্ছি। তুমি এগুলো হেফাজত করো এবং তোমার সন্তানের জন্য খরচ করো। আল্লাহর মঞ্জুর হলে ফিরে আসতে পারি আবার জিহাদে শহীদও হতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।

ফররুখ চলে যান জিহাদের ময়দানে। ফররুখ তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরই তার স্ত্রীর কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে এক পুত্রসন্তান। স্ত্রী এ শিশুকে দেখে ভুলে যান স্বামীর বিরহ। মায়াকাড়া চেহারার অধিকারী এ শিশুটি তাঁর সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। তিনি তার নাম রাখেন রাবিয়া। শিশুকাল থেকেই রাবিয়ার মাঝে ফুটে উঠতে থাকে এক অনন্য প্রতিভা। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস ফুটে উঠে ছোট বেলাতেই। শিশু রাবিয়া হয়ে ওঠেন তার মায়ের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু। ছোট্ট রাবিয়াকে ঘিরে তাঁর মায়ের সব স্বপ্ন আবর্তিত হতে থাকে। একটু বড় হলে তিনি তাকে উস্তাদের কাছে পড়তে দেন। অল্পদিনেই রাবিয়া লেখাপড়ায় উৎকর্ষসাধন করে। কুরআন হিফজ করে ও সুললিত ভঙ্গিমায় তা পাঠ করতে শিখে। সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করে নেয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও আরবী ভাষা এবং

যতটুকু সম্ভব দীনের হুকুম-আহকামও। উম্মে রাবিয়া ছেলের সম্মানিত ওস্তাদবৃন্দকে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন পেশ করেন। তিনি রাবিয়ার পিতার অপেক্ষা করতেন এবং চেষ্টা করতেন যাতে রাবিয়া একদিন তার এবং ফররুখের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং তার মাঝে যাতে তারা পান চোখের শীতলতা।

কিন্তু দিনে দিনে ফররুখের অনুপস্থিতি দীর্ঘতর হতে থাকে। তাঁর সম্পর্কে লোকমুখে নানান ধরনের কথা ছড়িয়ে পড়ে। কেউ বলতে থাকে, তিনি শত্রুর হাতে বন্দি হয়ে গেছেন। কেউ বলেন, তিনি এখনও জিহাদ করে যাচ্ছেন। যুদ্ধ-ফেরত তৃতীয় আরেকদল জানায়, তিনি জিহাদে বরণ করে নিয়েছেন তার কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত। ফররুখের দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উম্মে রাবিয়ার কাছে তার শাহাদাতের কথাই যথার্থ মনে হয়। সীমাহীন শোক-যাতনায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তিনি তা আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ করেন। ক্রমে ছোট্ট রাবিয়া বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত হন।

রাবিয়া একের পর এক পার হতে থাকে কাঙ্ক্ষিত মনযিলের সিঁড়ি। উপস্থিত হতে থাকে মসজিদে নববীর দরসে। মসজিদে নববী তখন ছিল নববী-ইলমের প্রাণকেন্দ্র। সর্বদা তা মুখরিত থাকত হাজারো জ্ঞান-পিপাসুর কোলাহলে। রাবিয়া সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের থেকে হাদীসের দরস নেয়। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন রাসূলুল্লাহর প্রিয় খাদেম হযরত আনাস বিন মালিক রাযি.। রাবিয়া দরস নেয় প্রথম শ্রেণির তাবেঈদের কাছ থেকে। যেমন হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব, মাকহুল শামী ও সালামা ইবনে দিনার প্রমুখ।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। রাবিয়া সমাসীন হয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের শীর্ষে। তাঁর নাম উচ্চারিত হতে থাকে মর্যাদাশীল জ্ঞানতাপসগণের সঙ্গে, প্রথম সারিতে। তাঁর জীবন হয়ে ওঠে ঈর্ষণীয়। রাবিয়া দিনের একভাগ নির্দিষ্ট করে নেয় গৃহে পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কাটানোর জন্য। আরেক ভাগ নির্দিষ্ট করে নেয় মসজিদে নববীর মজলিস ও হালাকাসমূহের জন্য।

এক চাঁদনি রাতের সন্ধ্যাবেলা মদীনার জনাকীর্ণ পথ ধরে চলছেন ষাটের কাছাকাছি বয়সের এক বৃদ্ধ, ঘোড়ায় চড়ে। তার পিঠে ঢাল, হাতে বর্শা, কোমরে বাধা তলোয়ার। একসময় তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন নিজ বাড়ির সামনে। উম্মে রাবিয়া উপর তলার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে স্বামীকে দেখতে পেলেন। তিনি নিচে নেমে স্বামীকে সালাম করলেন। স্বামীর উপস্থিতি তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল স্বপ্নের মতো। তিনি ভাবতেই পারছিলেন না যে, যিনি জিহাদে শহীদ হয়েছেন তিনিই আজ তার চোখের সামনে। ফররুখ স্ত্রীর কাছে বসে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। উম্মে রাবিয়া একপর্যায়ে রাবিয়াকে দেখিয়ে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান এ আপনার সন্তান। আপনার আদরের টুকরা। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফররুখ রাবিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ফজরের আযান শুনতে পেয়ে ফররুখ তড়িঘড়ি মসজিদে গেলেন। নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দেখতে পেলেন, মসজিদচত্বরে মানুষের ভিড়। বড় বড় ফকীহ, আমির-ওমারা, শ্বেত শশ্রুধারী বৃদ্ধ, তরুণ-যুবা-কিশোর-বালক ও শিক্ষার্থীরা সবাই একজন শায়খকে ঘিরে বসে রয়েছে। শায়খের মুখের প্রতিটি কথা তারা লুফে নিচ্ছেন মুক্তোর মতো। খাতায় লিখে নিচ্ছেন। মানুষের সংখ্যাধিক্যের কারণে মুবাল্লিগরা শায়খের প্রতিটি কথা পঙ্‌ক্তি করে পৌঁছে দিচ্ছেন মজলিসের প্রান্তদেশ পর্যন্ত। মজলিসে বিরাজ করছে পিনপতন নীরবতা। অদৃষ্টপূর্ব এই দৃশ্য দেখে ফররুখ বিস্মিত বিমোহিত হয়ে পড়লেন। তিনি শায়খের চেহারা দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অত্যধিক ভিড়ের কারণে পারলেন না। ফররুখ মজলিসের এক কোণে বসে পড়লেন। মজলিস শেষ হলে লোকেরা শায়খকে মসজিদের বাইরে এগিয়ে নিয়ে গেল। ফররুখ তার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! শায়খটি কে? লোকটি আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি? আপনি মদীনার লোক নন! ফররুখ বললেন, হ্যাঁ, আমি মদীনার লোক। লোকটি এবার ততোধিক বিস্মিত হয়ে বললেন, মদীনায় এমন কি কেউ আছে যে শায়খকে চেনে না? ফররুখ বললেন, হ্যাঁ, আমি প্রায় ত্রিশ বছর মদীনায় ছিলাম না।

তাই আমি শায়খের সঙ্গে পরিচিত নই। লোকটি বললেন, আচ্ছা! আপনি বসুন আমি শায়খের পরিচয় দিচ্ছি।

তারপর বলতে শুরু করলেন, তিনি তাবেঈদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং অনন্য মর্যাদার অধিকারী। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি অধিকার করেছেন মদীনার ফকীহ, ইমাম ও মুহাদ্দিসের আসন। তার মজলিসে অংশগ্রহণ করেন বড় বড় মুহাদ্দিস এবং ফকিহগণ। যেমন, মালিক ইবনে আনাস, আবূ হানিফা, ইয়াহয়া, ইবনে সাঈদ আনসারি, সুফিয়ান সাওরি, আবদুর রহমান ইবনে আমর আওযায়ী এবং লায়স ইবনে সাদ প্রমুখ। ফররুখ কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। লোকটি সে সুযোগ না দিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করলেন, সর্বোপরি তিনি বিনয়ী, নম্র এবং কোমল আচরণকারী। মদীনার লোকেরা তাঁর চেয়ে দানশীল, আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ সংযমী তাপস কাউকে জানে না। ফররুখ বললেন, তাঁর নাম কি? লোকটি বললেন, রাবিয়াতুর রায়। ফররুখ চমকে উঠলেন, রাবিয়াতুর রায়! লোকটি বললেন, হ্যাঁ, তার নাম রাবিয়া। কিন্তু মদীনার উলামায়ে কিরাম ও ফকীহগণ তাকে রাবিয়াতুর রায় নামে ডেকে থাকেন। কেননা কুরআন-হাদীসে কোনো বিষয়ে ফয়সালা না পেলে তারা তাঁর কাছে যান। তিনি তাতে ইজতেহাদ করে ফয়সালা প্রদান করেন। ফররুখ আগ্রহ সহকারে বললেন, তার বংশপরিচয় কী? লোকটি বললেন, তিনি রাবিয়াতুর রায় ইবনে ফররুখ আবূ আবদুর রহমান। তাঁর বাবা তাঁকে গর্ভে রেখে জিহাদে গিয়েছিলেন। তাঁর জন্মের পর তাঁর মা তাকে লালনপালন করেন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এতটুকু শোনার পর ফররুখের চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি দ্রুত বাড়ির দিকে ফিরে চললেন। প্রতি কদমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাঁর চলার গতি। তাঁর হৃদয়ে জাগছিল আনন্দের অনাবিল শিহরণ। বাড়িতে পৌঁছার পরই উম্মে রাবিয়াকে বললেন, আমি রাবিয়াকে এমন এক উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন দেখেছি, যেখানে কম লোকই পৌঁছুতে সক্ষম। উম্মে রাবিয়া বললেন, আপনার কাছে ত্রিশ হাজার দিনার বড় না এই মর্যাদা, যা আজ রাবিয়া অর্জন করেছে? ফররুখ বললেন, আল্লাহর কসম, সারা

দুনিয়ার চেয়েও এটা আমার কাছে বেশি প্রিয়। উম্মে রাবিয়া বললেন, আপনার ত্রিশ হাজার দিনার আমি রাবিয়ার শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যয় করেছি। আপনি কি এতে আনন্দিত? ফররুখ বললেন, হ্যাঁ, আমি আনন্দিত। আল্লাহ পাক তোমাকে আমার পক্ষ থেকে রাবিয়ার পক্ষ থেকে ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন।

এই তো সেই মহীয়সী, কল্যাণের আধার আদর্শ মা! যুগে-যুগে পৃথিবী যাঁদের থেকে লাভ করেছে কল্যাণ ও সওগাতের অফুরন্ত সম্ভার! আজকের এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে বড় প্রয়োজন এমন একজন আদর্শ মায়ের।

যারযুনা একজন মহীয়সী জননীর কথা

পৃথিবীর অনেক বড়-বড় ঘটনা ও ইতিহাসের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে নারীরই থাকে প্রধান ভূমিকা। পুরুষ রণাঙ্গনে তরবারি উচিয়ে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে ছিনিয়ে আনে একের পর এক বিজয়। তার আড়ালে প্রধান ভূমিকা পালন করে যে নারী, তার কথা ও অবদান ইতিহাসের পাতায় তেমন গুরুত্ব পায় না। তাদেরই একজন আহমদ শাহ আবদালির মহীয়সী মাতা। নাম যারযুনা। অত্যন্ত দীনদার মহিলা তিনি। যখন হিন্দুস্তানে মারাঠা বাহিনী বিজয় লাভ করল, তখন তারা আক্রমণ চালাতে চালাতে একেবারে উটক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সে সময় কান্দাহারে একটি মজবুত কেল্লা বানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংবাদ শুনে ভেতর থেকে আহমদ শাহ আবদালিকে ডাকা হলো। আহমদ শাহ আবদালি ভেতরে এসে দেখলেন তার শ্রদ্ধেয় মাতা রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি আহমদ শাহকে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আহমদ শাহ আবদালি জিজ্ঞাসা করলেন, আম্মা! আপনি কেন আমার উপর অসন্তুষ্ট? মাতা রাগান্বিত হয়ে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বললেন, আমি কি তোমাকে এজন্য জন্ম দিয়েছি যে, তুমি মারাঠাদের ভয়ে দূর্গ নির্মাণ করবে? আফসোস! যদি আমি তোমাকে দুধপান না করতাম! লালন-পালন না করতাম!

আহমদ শাহ আবদালি বললেন, আম্মা আমি ক্ষমা চাচ্ছি। এরপর তিনি হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মারাঠাদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ করলেন। অবশেষে পানিপথের রণাঙ্গনে মারাঠাদের দর্প চিরতরে বিচূর্ণ করে ভারতবর্ষে ইসলামের যাত্রাকে পুণরায় বেগবান করেন।

ইতিহাসে যে সমস্ত মুজাহিদের নাম চির উজ্জ্বল তাদের পেছনে কোনো না কোনো মায়ের প্রেরণা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যায়। হায়! তেমন মা আবার কবে আসবে! কবে আবার তার সন্তানেরা ইসলামের পতাকা নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে যাবে!

একজন আদর্শ মা

আল্লামা ইবনে জাওজি রহ. একজন মহীয়সী নারীর জিহাদী জজবা ও দীনের জন্য তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষার একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে আগত সকল মুসলিম নারীর জন্য রয়েছে অনুপম আদর্শ।

ইমাম জাওজি রহ. বলেন, আবূ কুদামা নামে মদীনা মুনাওয়ারায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদে কাটিয়েছেন। জিহাদী প্রেরণায় তিনি ছিলেন উজ্জীবিত।

একবার তিনি মসজিদে নববীতে বসে জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, হুযুর! জিহাদের ময়দানে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে আশ্চর্যজনক একটি কাহিনী আমাদের বলুন।

আবূ কুদামা রহ. বলেন, তবে শোনো। রাক্কা নামক এলাকায় আমাদের জন্য জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয় করতে গেলাম।

একদিন ফুরাত নদীর তীরে বসেছিলাম। এমন সময় একজন মহিলা আমার নিকট এসে বলল, আবূ কুদামা! আমি আপনার ব্যাপারে শুনতে পেয়েছি, আপনি জিহাদী বক্তৃতা করেন। জিহাদের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। আর নিজেও সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থাকেন।

আমাকে আল্লাহ তায়ালা লম্বা-লম্বা চুল দান করেছেন। আমি আমার উপড়ানো চুল দ্বারা একটি রশি পাকিয়েছি এবং এগুলোর সঙ্গে মাটি মিশিয়ে নিয়েছি যাতে চুলের বেপর্দা না হয়। আপনি আমার এই রশিটি নিয়ে যান। আপনি যখন জিহাদের ময়দানে শত্রুদের মুখোমুখি হবেন, প্রচণ্ড লড়াই শুরু হবে, তলোয়ারে তলোয়ারে ঘর্ষণ শুরু হবে, তির

নিক্ষেপ শুরু হবে, বর্শা নিক্ষেপ শুরু হবে, তখন আপনি এই রশিটিকে ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে নিবেন। এর দ্বারা সহায়তা নিবেন। যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তবে যার প্রয়োজন হবে তাকে রশিটি দিয়ে দিবেন। আমি চাই আমার চুলগুলোতে জিহাদের ধুলোবালি লাগুক, যা আমার পরকালে কাজে আসবে।

আমি একজন বিধবা। আমার স্বামী জিহাদে শহীদ হয়েছেন। আমার পুরো খান্দান জিহাদে শরীক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। আমার ওজরের কারণে আমি জিহাদে যেতে পারছি না। তাই দয়া করে আমার এই চুলগুলো নিয়ে যাবেন যাতে আমি জিহাদের সাওয়াব অর্জন করতে পারি।

মহিলাটি আবারও বলল, হে আবূ কুদামা! আমার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনুন। আমার স্বামী যখন শহীদ হন তখন তাঁর একজন ছেলে রেখে যান। সে কুরআনের হাফেজ। তিরন্দাজিতে সিদ্ধহস্ত। ঘোড়সওয়ারিতেও খুব দক্ষতা অর্জন করেছে। এভাবে জিহাদের খুটিনাটি অনেক কৌশল সে রপ্ত করে নিয়েছে। তাঁর বয়স পনেরো হয়েছে। এখন সে জমিনে কাজ করতে গিয়েছে। যখন সে ফিরে আসবে আমি তাঁকে আপনার নিকট পাঠিয়ে দেব। আমি এই নওজোয়ান ছেলেকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির জন্য আপনার নিকট পেশ করব। দয়া করে আপনি আমার এই ক্ষুদ্র হাদিয়াটুকু গ্রহণ করবেন। আপনাকে দীনে ইসলামের ইজ্জত ও গৌরবের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না।

শায়খ আবূ কুদামা রহ. বলেন, আমি মহিলার কাছ থেকে চুলের রশিটি নিয়ে নিলাম। অনুভব করলাম, সত্যিই এটা চুল দ্বারা বানানো হয়েছে। মহিলাটি আমাকে বলল, আপনি আমার সামনেই এই রশিটি আপনার সরঞ্জামাদির সঙ্গে হেফাজত করে নিন, যেন আমার আত্মা তৃপ্ত হয়।

আমি রশিটি তাঁর কথামতো হেফাজত করলাম এবং সাথীদের নিয়ে 'রাক্কা' হতে বের হয়ে এলাম।

আমরা যখন মাসলামা ইবনে আবদুল মালিকের দুর্গের নিকট পৌঁছলাম তখন পেছন থেকে একজন অশ্বারোহীর চিৎকার কানে এলো। সে বলছিল, আবূ কুদামা! থামুন। আমরা থেমে গেলাম। দেখলাম, একজন অশ্বারোহী অশ্ব হাঁকাতে হাঁকাতে ছুটে আসছে। এসেই সে আমার সঙ্গে মুসাফাহা-মুয়ানাকা করে বলল, আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে আপনার সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত করেননি। সে কাপড় দিয়ে তার চেহারা ঢেকে রেখেছিল। আমি তাকে বললাম, মুখোশ খোলো, যেন আমি দেখে নিতে পারি। যদি জিহাদ তোমার উপর ফরজ হয় আমি তোমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দেব। অন্যথায় তোমাকে ফেরত পাঠব।

সে তাঁর চেহারা খুলল। দেখতে পেলাম চাঁদের ন্যায় সুন্দর সুদর্শন একজন কিশোর আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আমি তাকে বললাম, বেটা! তোমার পিতা কি জীবিত আছেন?

সে বলল, না, আমার পিতা জীবিত নেই। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। আমি আমার পিতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই যাচ্ছি। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাকেও শাহাদাতে ধন্য করবেন।

তোমার মাতা জীবিত আছেন?

হ্যাঁ, মা জীবিত আছেন।

আমি বললাম, প্রথমে তোমার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। তিনি যদি অনুমতি দেন তবে তো ঠিক আছে। অন্যথায় তুমি তোমার মায়ের নিকট থেকে যাবে। কারণ এ মুহূর্তে জিহাদ ফরজে আইন নয়। আর মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।

ছেলেটি বলল, আবূ কুদামা! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

আমি বললাম, না। তোমাকে চিনব কীভাবে? তোমাকে তো কখনও দেখিনি মনে হচ্ছে।

নওজোয়ান বলল, আমি ওই মহিলার সন্তান যে চুলের রশি আপনার নিকট অর্পণ করেছেন। আপনি ভুলে গেলেন কেন? আমি ইনশাআল্লাহ

শহীদ হব। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে জিহাদে নিয়ে চলুন। আমি কুরআনের হাফেজ, তিরন্দাজ ও ঘোরসওয়ারিতে আমার এলাকায় আমার কোনো জুটি নেই। আমি ইসলামের অনেক মাসআলা সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেছি। ছোট বলে আমাকে অবহেলা করবেন না। আমার মা আমাকে শপথ করিয়েছেন, আমি যেন জীবিত ঘরে ফিরে না যাই। আমার মা আমাকে বলেছেন, বেটা! যখন কাফেরদের সঙ্গে লড়াই শুরু হবে তখন তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না বরং শাহাদাতের আশায় সম্মুখে এগিয়ে চলবে। জীবনকে আল্লাহর রাহে সোপর্দ করে দিবে। আর জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্য ও তোমার পিতার পড়শি হওয়ার জন্য দুআ করবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যখন শাহাদাতে ধন্য করবেন, তুমি আমার জন্যও সুপারিশ করো। কেননা আমি শুনেছি, একজন শহীদ তাঁর পরিবারের সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করতে পারে। তারপর আম্মাজান আমাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে এভাবে দুআ করেছেন, হে পরওয়ারদিগার! হে আমার মুনিব! এ আমার কলিজার টুকরা, নয়নমণি, হৃদয়ের ফুল, আমার জান। আমি একে তোমার দীনের খেদমতে পেশ করছি। তুমি তাকে কবুল করে নাও।

শায়খ আবূ কুদামা বলেন, আমি তার কথা শুনে খুব কাঁদলাম। কারণ ছেলেটি সুদর্শন। নওজোয়ান। আর তাঁর মা না-জানি কত ব্যথা হৃদয়ে চেপে রেখেছেন। কত বিশাল ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

যুবক বলল, চাচাজান আপনি কাঁদছেন কেন? যদি আমার অল্প বয়সের কারণে কেঁদে থাকেন, তবে মনে রাখবেন ছোটদেরকেও আল্লাহ তায়ালা নাফরমানির কারণে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

আমি বললাম, তোমার আম্মুর কারণে কাঁদছি। তোমার শাহাদাতের পর তোমার অসহায় মা কীভাবে জীবন কাটাবেন।

আমরা সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। রাতভর সফর হলো। রাত শেষে ভোর হলো। আমরা সফর করতেই লাগলাম। ছেলেটি আল্লাহ তায়ালার জিকিরে মশগুল ছিল। এভাবে দ্বিতীয় দিনও আমাদের সফর

অব্যাহত থাকে। আমি গভীরভাবে লক্ষ করলাম, ছেলেটি ঘোরসওয়ারিতে খুবই দক্ষ। অন্যান্য জিহাদী প্রশিক্ষণে ছিল অন্য দশজনের তুলনায় অগ্রগামী।

পরেরদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা শত্রু-এলাকায় প্রবেশ করি। আমরা সেখানে ছাউনি ফেললাম। আমরা ছিলাম রোযাদার। ছেলেটি আমাদের জন্য ইফতারের আয়োজন করছিল। লাগাতার সফর এবং জেগে থাকার কারণে ছেলেটি ক্লান্ত ছিল। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম ছেলেটি মুচকি হাসছে। দারুণ সুন্দর লাগল তার সেই পবিত্র হাসি। আমি সাথীদের ডাকলাম। তারাও দৃশ্যটি দেখে অভিভূত হলো।

ঘুম থেকে জেগে উঠলে আমি তাকে বললাম, প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে এই মাত্র হাসতে দেখলাম। তুমি ঘুমে হাসছিলে কেন বলো তো বাবা?

নওজোয়ান বলল, আমি একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখলাম। সে কারণে হয়ত হাসছিলাম। স্বপ্নটি ছিল এ রকম- সবুজ-শ্যামল, নয়নকাড়া একটি স্থানে আমি পৌঁছলাম। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। ফুলে ফুলে ভরে আছে আশপাশ। মনোলোভা সেই দৃশ্য। আমি তাতে বিচরণ করছিলাম। এবং খুবই আনন্দ অনুভব করছিলাম। চলতে-চলতে সামনে একটি নয়নাভিরাম অট্টালিকা দেখতে পেলাম। সবুজ গম্বুজে অট্টালিকাটি সত্যিই অবাক করার মতো, যা হীরা-মণি-মুক্তা এবং স্বর্ণ-রুপায় খচিত। দরজাটি ছিল চমকানো স্বর্ণের, যা সুনিপুণভাবে পর্দাবৃত। দরজার পর্দাটি ধীরে-ধীরে উন্মুক্ত হলো। দেখলাম, কয়েকজন মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েগুলো চাঁদের ন্যায় ঝলমল করছিল। তারা সবাই মিলে আমাকে মোবারকবাদ দিল। আমি তাদের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। তখন সে আমাকে বলল, এত জলদি করবেন না। এখনো আপনার সময় আসেনি। আমরা আপনার স্ত্রী নই। আমরা আপনার স্ত্রীর বাঁদীমাত্র। আপনার স্ত্রীর নাম মারজিয়া। আপনার উপর আল্লাহ রহম করুন। আপনি আরও সম্মুখে অগ্রসর হোন।

আমি গভীর আবেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। দেখলাম এ প্রাসাদে একটি কামরা রয়েছে, যা অনেকটা উঁচু স্থানে এবং সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী। এর ভেতরে অতি মূল্যবান জমরুদ পাথরের একটি খাট রয়েছে, যার পায়াগুলো সাদা চকচকে। আমি নয়নকাড়া এই শোভা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম, তার মধ্যে অতি সুন্দরী একজন যুবতী বসে আছে। তাঁর রূপ-যৌবনের কোনো উপমা হয় না। মনে হয় যেন সদ্য প্রস্ফুটিত একটি শিশির-ভেজা গোলাপ। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে। আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হলে সে বলল, স্বাগতম আমাদের এই ভুবনে। তবে এখনো তোমার সময় হয়নি। হ্যাঁ, আগামীকাল দ্বিপ্রহরের সময় তোমার আমার মিলন হবে।

শায়খ বলেন, আমি যুবককে বললাম, তুমি দারুণ সুন্দর ও মূল্যবান স্বপ্ন দেখেছ। তুমি সত্যিই ভাগ্যবান।

তারপর আমরা রাতভর যুবকের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম। কিছুতেই ফল মেলাতে পারলাম না।

পরদিন। প্রত্যুষে আমরা অজু-ইসতেনজা সেরে আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালাম। নামায শেষে কায়মনোবাক্যে সকলেই মহান প্রভুর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলাম। এবং সারিবদ্ধ হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনী আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তারা স্রোতের ন্যায় ধেয়ে আসতে লাগল। সংখ্যায় তারা আমাদের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। সমুদ্রের ন্যায়, যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিল।

শুরু হলো হামলা। পাল্টা হামলা। মরণপণ লড়াই। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ নওজোয়ান কাফের বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে শত্রুদের ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাফেরদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাদের তছনছ করতে লাগল। ওদের কয়েকজন বাহাদুরকে সে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিল। আর বহুজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আমি যুবকটির এলোপাথাড়ি হামলা দেখে তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁর

লাগাম ধরে বললাম, বেটা! তুমি এবার ফিরে এসো। তুমি নবীন। অনভিজ্ঞ। যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

নওজোয়ান বলল, চাচাজান আপনি কি কুরআনে কারীমের এই আয়াতটি পড়েননি,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ

অর্থ- হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন তোমরা পিছপা হবে না।[১]

চাচাজান, আপনি কি চান আমি পিছপা হয়ে জাহান্নামের উপযোগী হয়ে যাই?

অকস্মাৎ একদল কাফের এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। আমরা তাদের বেষ্টনীতে পড়ে উপর্যুপরি হামলা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি তাদের বেষ্টনী হতে বেরিয়ে পড়লাম। এভাবেই আমরা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। কাফেরদের এই ঝটিকা আক্রমণটি এতই প্রবল ছিল যে, এতে আমাদের অনেক সাথী শাহাদাত বরণ করল। এভাবেই সমাপ্ত হলো একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

তারপর আমি আমার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র রণক্ষেত্র ঘুরে দেখতে লাগলাম। চারদিকে লাশ আর লাশ। কিছুক্ষণ আগে রক্তের বৃষ্টি হয়েছে যেন এই জায়গাটিতে। জায়গায় জায়গায় শহীদের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে আছে। ধুলো-মাটিতে চেনা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর। হঠাৎ দূরে একটি ঘোড়ার নিচে পিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। আমি দৌড়ে তাঁর নিকট পৌঁছে দেখি সে আর কেউ নয়। আমার সেই প্রিয় কিশোরটি। আরও নিকটে পৌঁছে দেখি ক্ষীণ আওয়াজে সে কি যেন বলছে।

---

১. সূরা আনফাল: ১৫

রক্ত আর ধুলো-বালিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর সুন্দর চেহারা। কান পেতে শুনতে পেলাম সে বলছে, আমাকে আমার চাচা আবূ কুদামার নিকট নিয়ে চলো।

আমি বললাম, বেটা! আমিই আবূ কুদামা!

নওজোয়ান বলল, চাচাজান, আমার স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমি জান্নাতের নাজ-নেয়ামত এবং হুর-গোলামদের দেখতে পাচ্ছি। আমি চললাম। আপনি আমার জন্য দুআ করবেন চাচাজান!

আমি বললাম, বেটা! কেয়ামতের কঠিন দিবসে তোমার সুপারিশে আমাকেও স্মরণ রেখো।

আমি তাঁর চেহারার দিকে ঝুকে পড়লাম। তাঁর কপালে চুমু খেলাম। এবং আমার চাদর দিয়ে তাঁর চেহারা থেকে মাটি ও রক্ত মুছতে লাগলাম।

সে আবার ক্ষীণ আওয়াজে বলল, চাচাজান, এ খুন মুছবেন না। আমি এ খুন নিয়ে আমার প্রভুর দরবারে হাজির হতে চাই। চাচাজান! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যদি আপনি সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে যান, তাহলে আমার এই রক্তমাখা কাপড়গুলো আমার মায়ের নিকট পৌঁছে দিবেন। আর বলবেন, আপনার ছেলে আপনার অসিয়ত পুরোপুরি আদায় করেছে। শত্রুদের মোকাবেলায় পিছপা হয়নি। জাতির সঙ্গে বেঈমানী করেনি। আর আপনি তাঁকে আমার সালাম দিয়ে বলবেন, আল্লাহ তাঁর উপঢৌকন কবুল করেছেন। চাচাজান! আমার ছোট একটি বোন আছে। বয়স দশ বছর হবে। সে আমাকে খুব মহব্বত করে। আমি যখনই ঘর হতে বের হতাম সে আমাকে বিদায় জানাত। আবার যখনই ঘরে ফিরতাম সবার আগে সেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। সালাম জানাত। আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করত। এবার শেষবারের মতো যখন ঘর হতে বের হই সে আমাকে বলল, ভাইজান, কোথায় যাচ্ছেন? জলদি ফিরে আসবেন। আপনাকে ছাড়া আমার কষ্ট হবে।

আমার এই দুঃখিনী বোনটির সঙ্গে যখন আপনার সাক্ষাৎ হবে, তাকে বলবেন, তোমার ভাই বলেছে, কেয়ামতে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।

কথাগুলো বলে নওজোয়ান কালেমা শাহাদাত পড়ে নিল। তারপর নশ্বর এই পৃথিবী ছেড়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেল। আমরা তাঁকে এ কাপড়েই দাফন করলাম। তারপর ফিরে এলাম।

আমরা যখন রাক্কায় ফিরে এলাম তখন আমি প্রথমেই ওই যুবকের বাড়ি গেলাম। দেখি ঐ যুবকের মতো সুন্দর একটি মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আর যুদ্ধ-ফেরত লোকেদেরকে তাঁর ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে। সবাই নেতিবাচক উত্তর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমি যখন তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম সে আমাকে বলল, চাচাজান! আপনি আমার ভাইটির কোনো সংবাদ জানেন? আপনি কি রণাঙ্গন থেকে এসেছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি রণাঙ্গন হতে মাত্রই ফিরে এসেছি।

মেয়েটি বলল, আপনি কি আমার ভাইয়ার কোনো সংবাদ দিতে পারবেন, আমি খুব... সে চিৎকার দিয়ে উঠল। ভাইয়ের বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারছিল না সে।

আমি আমার কান্না চেপে রাখলাম। আর মেয়েটিকে বললাম, যাও তোমার আম্মুকে গিয়ে সংবাদ দাও, আবূ কুদামা এসেছে।

মহিলা আমার এই কথোপকথন শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর হতে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আবূ কুদামা আপনি আগে বলুন, আপনি আমাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন না দুঃসংবাদ? আমি বললাম, আপনি আগে সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদের ব্যাখ্যা বলুন।

তিনি বললেন, আমার ছেলে যদি সুস্থ ও নিরাপদে ফিরে আসে, তবে এটা হবে আমার জন্য দুঃসংবাদ। আর যদি আমার কলজে-ছেঁড়া ধনকে আল্লাহ তায়ালা শাহাদাতে ধন্য করেন তবে এটা হবে আমার জন্য সুসংবাদ।

আমি বললাম, আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ। যদি তাই হয় তাহলে আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। আপনার ছেলে রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করেছে।

তিনি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বললেন, আপনার উপর আল্লাহ তায়ালা রহম করুন হে আবূ কুদামা! সত্যিই আপনি আমার জন্য এক পরম সুসংবাদ বয়ে এনেছেন। আখেরাতের জন্য এরচেয়ে বড় পুঁজি আমার আর কিছু হতে পারে না। আমার অশান্ত দিল এখন শান্তি লাভ করল।

তারপর আমি ওই নওজোয়ানের সংবাদ তাঁর বোনকে দিলাম। 'আল্লাহ হাফেজ, কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎ হবে।' মেয়েটি এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ল।

আমি তাঁর শিরায় হাত রেখে দেখলাম, সেও আর ইহজগতে নেই। ভাইয়ের মতো ছোট বোনটিও আলবিদা জানাল এই নশ্বর পৃথিবীকে।

আমি শহীদ নওজোয়ানের রক্ত মিশ্রিত কাপড়খানা তাঁর মায়ের নিকট সোপর্দ করলাম। আমার হৃদয়চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসছিল। যেন আমিও শামিল হই তাঁদের কাতারে। কোনোমতে নিজেকে সংবরণ করে ভগ্নহৃদয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম...।

শহীদের মায়ের ধৈর্য দেখে সত্যিই আমি অভিভূত।

মহীয়সী জননী উম্মে ইবরাহিম

ইরাকের বসরা নগরী। প্রাচীন নগরী। স্বপ্নের শহর। সে যুগে বসরা ছিল জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ। মুজাহিদদের অজেয় ক্যাম্প। এই নগরীতে জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত কয়েকজন মুজাহিদ নারী ছিলেন, যাঁদের ত্যাগের কথা পৃথিবী ভুলতে পারবে না কোনোকালে। উম্মে ইবরাহিম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তার ঈমানী চেতনা, জিহাদী উদ্দীপনা আজও মুমিনদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ত্যাগের পথকে উন্মুক্ত সুপ্রশস্ত করে। শাহাদাতের পথকে করে সুগম। বিজয়কে করে তরান্বিত।

ইসলামের শত্রুরা সীমান্ত এলাকায় তুমুল আক্রমণ করছিল তখন। তাই সাধারণ মুসলিম জনতাকে জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত করা ছিল খুবই প্রয়োজন। শুরু হলো বিভিন্ন সভা, ওয়াজ-মাহফিল, বয়ান-বক্তৃতা।

প্রখ্যাত মুজাহিদ নেতা শায়খ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়েদ বসরী রহ. ছিলেন বসরার অন্যতম আলেমে দীন। জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনিও একটি সভায় বক্তৃতা করছিলেন।

জিহাদী বক্তৃতা। অগ্নিঝরা বয়ান। আমজনতা, আলেম এবং সবশ্রেণির মানুষে ভরপুর মজলিস। শায়খ তার বক্তৃতায় জান্নাতের নেয়ামতরাজির কথা আলোচনা করলেন। সঙ্গে হুরদের আলোচনাও করলেন। হুরদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য সম্পর্কে একটি আবেগময় কবিতা আবৃত্তি করলেন, যা শুনে মানুষের মধ্যে এক অন্যরকম উন্মাদনা সৃষ্টি হলো। জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে গেল সবাই। আবেগ উচ্ছ্বাসের এক তুফান বয়ে গেল পুরো মজলিসে।

উম্মে ইবরাহিমও উপস্থিত ছিলেন উক্ত মজলিসে। তার শিরা-উপশিরায় খুন টগবগ করতে লাগল। আবেগে, উচ্ছ্বাসে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, হে আবূ উবাইদ! আপনি জানেন যে, এ শহরের এমন কোনো পরিবার নেই যেই পরিবার থেকে আমার ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিবাহ দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু আমি কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। আপনি এখন যে হুরের সৌন্দর্য, লাবণ্য সম্পর্কে বয়ান করলেন, সত্যিই তা আমাকে অবাক করেছে। তার উৎকর্ষ হৃদয়ে এক অপার্থিব আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। আমি আমার ছেলেকে সেই হুরের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই। আপনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করুন। আর কবিতাটি আবার আবৃত্তি করুন।

শায়খ আবদুল ওয়াহিদ তাঁর কবিতাটি আবার আবৃত্তি করলেন, যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই—

আলোর জন্ম হয় তাঁর চেহারার আলো থেকেই।
খোশবুর উৎপত্তি খাঁটি আতর থেকেই।
এই হুর যদি নিজের জুতো দিয়ে বালুকারাশিকেও পদাঘাত করে,
তবে বৃষ্টি ছাড়াই সারাপ্রান্তর প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।
যদি তার মুখের মধুময় থুতু সাগরে নিক্ষেপ করা হয়,
তবে সমুদ্রের পানি স্থলভাগের প্রাণীর জন্য মিষ্টি-মধুর হয়ে যাবে।
কারও দৃষ্টি যখন তার গণ্ডদেশে পতিত হয় তাহলে সম্ভাবনা আছে-
তাঁর জল্পনা-কল্পনা হুরের গণ্ডদেশকে জখম করে দিবে।

কবিতাগুলো শুনে উপস্থিত লোকেরা আত্মহারা হয়ে গেল। উম্মে ইবরাহিম সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেন, হে আবূ উবাইদ! মেয়েটির রূপ-সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি আমার ছেলের সঙ্গে তাঁকে বিবাহ পড়িয়ে দিন। দেনমোহর হিসেবে দশ হাজার দিনার এবং আমার ছেলেকে দিলাম।

তারপর আমার একমাত্র কলিজার টুকরা ইবরাহিম আপনার সঙ্গে জিহাদে যাবে। আল্লাহ তায়ালা আমার ছেলেকে শহীদের উচ্চ মর্যাদা

দান করবেন এবং কেয়ামতের ময়দানে সে আমার জন্য এবং তাঁর পিতার জন্য সুপারিশ করবে।

শায়খ আবূ উবাইদ বললেন, আপনি যদি সত্যিই এমনটি করতে চান তা হলে অবশ্যই আপনি, আপনার ছেলে এবং তাঁর পিতা সফলকাম হবেন।

এরপর উম্মে ইবরাহিম উল্লাসিত হয়ে বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি কি এসব গুণে গুণান্বিত মেয়েকে বিবাহ করতে প্রস্তুত? তাহলে এর দেনমোহরস্বরূপ তুমি নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করো। আর ভবিষ্যতে কোনো গুনাহ করবে না।

যুবক ইবরাহিম বলল, আমি প্রস্তুত আম্মাজান। ছেলের কথা শুনে ইবরাহিমের আম্মা দু'হাত উঁচু করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার মাওলা! তুমি সাক্ষী থেকো। আমি আমার ছেলেকে এই হুরের সঙ্গে বিবাহ দিলাম। এই শর্তে যে, জিহাদ করে সে তাঁর প্রাণ তোমার রাহে কোরবান করবে। আর জীবনে কখনও গুনাহ করবে না। হে প্রভু, তুমি কবুল করো।

তারপর উম্মে ইবরাহিম ঘরে চলে গেলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দশ হাজার দিনার নিয়ে উপস্থিত হলেন। শায়খের হাতে দিনারগুলো দিয়ে বললেন, এই নিন আমার পুত্র-বধূর দেনমোহর। এগুলো জিহাদের কাজে আসবে।

তারপর তিনি তাঁর পুত্রের জন্য একটি তেজি ঘোড়া ক্রয় করলেন। এবং যুদ্ধের সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিয়ে বললেন, বেটা! যাও। আল্লাহর দীন বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর রাহে তোমার জীবন উৎসর্গ করে দাও। আর শোনো, তোমার আমার দেখা এই দুনিয়ায় নয় আখেরাতে, যখন তুমি শুহাদার কাতারে থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে ইবরাহিম ছেলেকে কর্পুর মিশ্রিত সুগন্ধিযুক্ত কাফনের কাপড় সঙ্গে দিয়ে দিলেন। তারপর শায়খ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বসরা নগরী ত্যাগ করে দূরে এক রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন।

শায়খ আবদুল ওয়াহিদ বলেন, যখন আমরা শত্রুদের এলাকায় পৌঁছলাম। সবাই খোলা প্রান্তরে নেমে এলো এবং ব্যাপক হামলা হলো। ইবরাহিম ছিল তখন সম্মুখ-সারিতে। প্রাণপণ লড়াই করল। শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে তছনছ করে দিল। নির্বিকার চিত্তে লড়াই করতে লাগল। দারুণ ছন্দে আছে সে।

একসময় শত্রুদের বিশাল বাহিনী তাদের বেষ্টনিতে আবদ্ধ করে ফেলল ইবরাহিমকে। এভাবে শহীদের অমৃত সুধা পান করল সে। কিছুক্ষণ পর এই যুদ্ধে আমরাই বিজয়ী হলাম।

এরপর আমরা বসরায় পৌঁছে সাথীদের বললাম, উম্মে ইবরাহিমকে আমি সংবাদ দেওয়ার পূর্বে তোমরা কেউ কিছু তাকে বলো না। তাঁকে আমিই সান্ত্বনা দেব যাতে এমন না হয় যে, সে অধৈর্য হয়ে পড়ে আর তাঁর সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়।

আমরা যখন বিজয়ীর বেশে বসরায় ফিরে এলাম তখন শহরের লোকজন আমাদের স্বাগত জানাতে প্রচণ্ড ভিড় করল। এর মধ্যে উম্মে ইবরাহিমও ছিল।

উপচে পড়া ভিড় ঠেলে সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আবূ উবাইদ! বলুন, আল্লাহ কি আমার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন? যদি গ্রহণ না করেন তাহলে আনন্দের আয়োজনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

শায়খ বললেন, হে উম্মে ইবরাহিম! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। ইবরাহিম এখন শহীদদের সঙ্গে উৎফুল্লচিত্তে পানাহারে মশগুল আছে।

উম্মে ইবরাহিম আনন্দ ধরে রাখতে পারলেন না। আত্মহারা হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

একজন আদর্শ মায়ের কারগুজারি

আফগানিস্তান। শুহাদায়ে কেরামের রক্তে সিঞ্চিত ভূমি। আমির আবদুর রহমান খান ছিলেন কাবুলের গভর্নর। তাঁর দাদা আমির দোস্ত মুহাম্মাদের একটি ঘটনা। কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁর পুত্রের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন তিনি। দুই তিনদিন পর সংবাদ এলো, শাহজাদার পরাজয় আসন্ন। সেনাদের নিয়ে তিনি পিছু হটছেন। আর শত্রুবাহিনী তাকে ধাওয়া করে আসছে। এ সংবাদ শুনে দোস্ত মুহাম্মাদের মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। লজ্জা, অনুশোচনা, দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি। তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একে তো পরাজয়ের গ্লানি। অন্যদিকে পুত্রের দুর্বলতা। লোকজনের কাছে কীভাবে মুখ দেখাবেন তিনি।

বাদশা ঘরে এলেন। স্ত্রীকে পুত্রের দুর্বলতার কথা বললেন। স্ত্রী সব শুনে বললেন, পুরো ঘটনাই তো মিথ্যা ও অবান্তর।

বাদশা বললেন, গোয়েন্দা রিপোর্ট কীভাবে মিথ্যা হতে পারে?

বেগম বলল, আমি কিছুতেই এই রিপোর্টের সত্যতা স্বীকার করতে পারব না। আমার ছেলে পরাজিত হতে পারে না। পারে না সে রণাঙ্গন হতে পালিয়ে পিছু হটতে।

বেগম সাহেবার কথা অবজ্ঞা করে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন বাদশা। তার পরদিন রণাঙ্গন হতে তাজা সংবাদ এলো, প্রথম দিনের সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। বাস্তব ঘটনা হলো, তাঁর ছেলে যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসছেন। শুনে বেগম সাহেবা আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

বাদশা বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে জানলে তোমার পুত্র পরাজয় বরণ করেনি। সে পিছু হটতে পারে না। তুমি এত দৃঢ়তার সঙ্গে কীভাবে বলতে পারলে?

তোমার নিকট এমন কী প্রমাণ ছিল যার দ্বারা গোটা হুকুমতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে? বেগম সাহেবা বললেন, তেমন কিছুই না। কেবল আল্লাহ তায়ালা আমার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। এ এক গোপন রহস্য, যা আমি প্রকাশ করতে চাই না।

অনেক পীড়াপীড়ির পর বেগম বললেন, এ ছেলে যখন আমার গর্ভে আসে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কোনো সন্দেহযুক্ত খাবার যেন আমার পেটে না যায়। কারণ হালাল খাদ্যের দ্বারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী সন্তান জন্ম লাভ করে। অপরদিকে হারাম খাদ্যের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এ শাহজাদা আমার গর্ভে থাকা অবস্থায় নয় মাস আমি এমন খাদ্য গ্রহণ করিনি, যা হালাল হওয়ার ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ থাকতে পারে।

তাই আমি কল্পনাও করতে পারি না। তার চরিত্র খারাপ হতে পারে সুতরাং এমন আখলাকের অধিকারী মানুষের পরিচয় হলো, যুদ্ধে গেলে হয়ত শাহাদাত বরণ করবে অন্যথায় বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনবে। এ দু'টো ব্যতীত তৃতীয় কিছু হতে পারে না। সুতরাং আমি কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি আমার ছেলে পিছু হটে আসছে? ময়দান থেকে পলায়ন করে আসছে, আমি কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি বলুন?

তাছাড়া আরও একটি কথা, এই ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও কোনো সন্দেহযুক্ত আহার আমি গ্রহণ করিনি যাতে উক্ত হারাম খাদ্যের দ্বারা শরীরে দুগ্ধ সঞ্চার হয়ে এই খাবারের প্রভাব শাহজাদার উপর না-পড়ে। এ ছাড়াও যখনই আমি তাকে দুধ পান করাতাম আগে অজু করে পাক-পবিত্র হয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিতাম, যেন শাহজাদার আখলাক-চরিত্র সুন্দর হয়। উন্নত রুচিসম্পন্ন হয়। আর এজন্যই আমি আপনার হুকুমতের সকলের কথা উড়িয়ে দিতে, মিথ্যা ও অবান্তর বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিনি। আমার বিশ্বাস একটুও বিচ্যুত হয়নি।

সাঈদা রহ. সমকালীন নারীদের আদর্শ

চিরসত্য ও শাশ্বত ধর্ম ইসলাম। হক ও বাতিলের প্রভেদকারী ধর্ম ইসলাম। ইসলামের খাতিরে ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়, ছেলে পিতার খুনপিয়াসী হয়ে ওঠে। আবার শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে এরূপ উপমা ভুরিভুরি পাওয়া যায়। এমনকি এখনো ঘটছে এমন অনেক কাহিনী। আমরা তার ক'টিরই-বা খবর রাখি!

এমনই একটি ঘটনা সাম্প্রতিক আফগান-কন্যা বীরপত্নী সাঈদার জীবনে ঘটেছে। বাড়ি আফগানিস্তানের নাগমান প্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সাঈদা ছিল সচ্ছল পরিবারের আদরের কন্যা। রূপে, গুণে আর দশজনকে হার মানায় সে। তবে এরমধ্যে সবচেয়ে বড় গুণটি হলো তাঁর ঈমানী জজবা। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। দীনের জন্য সবকিছু কোরবানি করতে প্রস্তুত।

তখন রাশিয়ানরা আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করত। হত্যা ছিল তাদের মজার খেলা। সাঈদার ভাই শের আফজাল একজন কট্টর কমিউনিস্ট। রাশিয়ান লাল-বাহিনী আফগানিস্তানে আসার পর সে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যায় অগ্রগামী ছিল।

খুনপিয়াসী রুশ বাহিনী একদিন বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করল। অসংখ্য নারী-পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করল। জায়গায় জায়গায় শুধু লাশ আর লাশ। চারদিকে শুধু রক্তের ছাপ। নরদমা দিয়ে পানির বদলে প্রবাহিত হতে লাগল রক্তের স্রোত।

বিধ্বস্ত ঘরগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছিল। নিষ্পাপ মা-বোনদের রোনাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। সে এক করুণ দৃশ্য!

রাতের প্রথমভাগে শের আফজাল একদল কম্যুনিস্ট সেনা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। বোন সাঈদা তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। তাঁর মাথায় এক অভিনব বুদ্ধি খেলে গেল। এই তো সময় প্রতিশোধ নেবার। সাঈদা রুশ ও কম্যুনিস্ট সেনাসদস্যদের দারুণ আপ্যায়ন করল। তাদেরকে বলল, তোমরা খুব ভালো কাজ করেছ। দুশমনদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছ। তোমাদের আক্রমণে আমি যারপরনাই খুশি হয়েছি। এখন আমার অন্তর ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি চাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে যাব। শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের সহায়তা করব।

শের আফজাল ও অন্য কমিউনিস্ট সেনারা খুব সন্তুষ্ট হলো। যাক, সাঈদা তাহলে এবার আমাদের দলে এলো। ওর পুরাতন চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। সাঈদা বলল, তবে আমার একটি আবদার। আজ রাত্রিটা তোমরা আমার গরিবালয়ে থেকে যাবে। মন ভরে তোমাদের আপ্যায়ন করব আমি।

রুশরা আরও আনন্দিত হলো। সাঈদার ভাই ও অন্যান্য রুশ সেনা তাঁর নিমন্ত্রণ কবুল করে নিল। তারা রাত্রে সেখানেই অবস্থান করল।

শুরু হলো খাবার আয়োজন। সে খুব খাতির-তোয়াজ করল তাদের। এবার মদের পালা। চলল অনেকক্ষণ। নাচ-গান তো আছেই। এছাড়া ওদের রাত কাটে কীভাবে? ধীরে-ধীরে সবাই নেশার আমেজে ঘুমিয়ে পড়ল। সাঈদা অনুভব করল নেশায় তারা এখন অচেতন। ধীরে-ধীরে ধারালো তরবারি দিয়ে এক রুশ সৈনিকের দেহ থেকে ধর আলাদা করে ফেলল। এরপর আরেকটি। এভাবে সব সৈনিককে হত্যা করল। বীরাঙ্গনা সাঈদা অবশেষে আপন ভাই শের আফজালকে জাগিয়ে তুলল।

ভাইজান, তোমার সঙ্গীদের পরিণতি একবার দেখে নাও। সে তাদের সবাইকে দেখে চমকে উঠল। এ কী, এরা রক্তাক্ত কেন? যেন রক্তের বন্যা বইছে এখানে। চিৎকার দিয়ে উঠল শের আফজাল।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মেয়ে সাঈদা ভাইকে বলল, ভাইজান! এত চেঁচামেচি করো না। তোমার অবস্থাও তাই হবে যেমন তাদের দেখছ।

সঙ্গীদের লাশের মধ্যে তোমার মৃত অবয়বটা একবার দেখে নাও। নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যার পরিণতি শেষবারের মতো দেখে নাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেইদিন অবশ্যই আসবে যখন সকল রাশিয়ান সেনা ও কমিউনিস্টদের এমন পরিণতি হবে, যা এখন দেখছ। মুসলমানের পবিত্র খুন বৃথা যাবে না। যেতে পারে না। আফগানরা স্বাধীনতার মুখ দেখবেই। স্বাধীন সূর্য এই পবিত্র মাটিতে উঠবেই। শহীদদের রক্ত দিয়ে লেখা হবে স্বাধীনতার ইতিহাস। তবে সেইদিন তুমি থাকবে না। ভাই শের আফজ়াল বোন সাঈদার ঈমানী জজবা দেখে ভড়কে গেল। ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু বীরাঙ্গনা সাঈদা তাকে ক্ষমা করবে কেন?

আমি তোমাকে ক্ষমা করলেও নিষ্পাপ শিশু সন্তান, নারী-পুরুষের তাজা রক্ত তোমাকে ক্ষমা করবে না। আমি তাঁদের হয়ে আজ তোমার থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছি। এই বলে সাঈদা নিজ ভাইকে তরবারির এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল কমিউনিস্ট আফজাল। ঈমানী জজবা ও দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত উপমা পেশ করল সাঈদা।

বীরাঙ্গনা সেই মেয়েটি রুশদের হেলিকপ্টারের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। তবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত নারীদের জন্য রেখে গেলেন এক উজ্জ্বল উপমা।

ভাগ্যবতী এক নারীর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক কাহিনী

২০০০ সালের শীতকাল। চেচনিয়ার আলদী নামক গ্রামে সঙ্ঘটিত হয় একটি হৃদয়বিদারক কাহিনী।

চার বছরের বালক আসলাম তার রক্তাক্ত মাকে ঝাঁকিয়ে জাগানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তার মা কোনোভাবেই শুনছেন না। আর তার আহত দাদা তারই একপাশে পড়ে ছিল।

তারা মাটির নিচে বাঙ্কারের মতো বানিয়ে তার ভেতর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত। আর কখনো বের হওয়ার প্রয়োজন হলে বের হত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। কারণ তাদের শহরে অবিরাম গোলা বর্ষণ চলছে। যখন অল্প সময়ের জন্য গোলা বর্ষণ বন্ধ হত তখন শহরটি যেন মৃতপুরীর মতো নিস্তব্ধ হয়ে যেত। মনে হত এখানে আর কোনো প্রাণী বেঁচে নেই।

আসলামের দাদা বললেন, গোলা আমাদের ঘরেও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আমাদের ঘরের দরজাগুলো আগুনে জ্বলছিল। কিন্তু আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। কারণ আমি মারাত্মকভাবে আহত। আমার দেহ হতে অবিরত ধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। আর আমার আদরের পুত্র-বধূর লাশ আমার পাশেই পড়ে ছিল।

ছয় মাসের ছোট্ট শিশু আলী তার মায়ের কোলে পড়ে অবিরাম কাঁদছিল। ছেলেটি অনেকক্ষণ যাবৎ ক্ষুধার্ত তাই মায়ের স্তন হতে দুধ পান করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। যদি তার কান্না শুনতে পেতে তাহলে অনুভব করতে যে, তাতে বিশ্ববাসীর প্রতি শত ধিক্কার লুকিয়ে রয়েছে। কেন পৃথিবী তাকে তার পানাহারের অধিকার হতে বঞ্চিত করল? মায়ের স্নেহ হতে এত সকালেই সরিয়ে দিল কেন? আর কেন-ইবা তাকে এতিম করল?

আসলাম চঞ্চলভাবে ছুটোছুটি করছিল। সে বয়স্ক মানুষের মতো আমাকে বলল, দাদু! কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। সে ছুটে এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

কেঁদো না আলী! অশ্রু বিসর্জন দেওয়া পুরুষের জন্য শোভা পায় না। তুমি এখন বড় হয়েছ। তাই তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, রাশিয়ানরা তোমার মাকে শহীদ করে দিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আসলাম তার ছয় মাসের ভাইটিকে কি বোঝাচ্ছে। যেন তার ভাই তার সব কথাই বুঝছে। অবশেষে শিশু আলী কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ধ্বংসস্তুপ হতে মুক্ত হতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পারলাম না। আমার পা অবাধ্যতা করছিল। দু'টি পায়ের হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

আমি ভগ্নহৃদয়ে এতিম নাতীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলাম, সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে আসলাম। ধৈর্য ধারণ করো। তুমি তো পুরুষ মানুষ।

সে আমাকে বলল, কই আমি তো কাঁদছি না। আমার শুধু মায়ের জন্য কষ্ট হয়। আর এজন্য আমার কান্না পাচ্ছে। আসলে আমি কাঁদছি না। দাদু! তুমি কি আমার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?

তখনও তার চোখ হতে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। সে তার মায়ের পা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এভাবে সে দীর্ঘ সময় ধরে কেঁদেই চলল, আমি তাকে বিরক্ত করলাম না। কেউ তো তার মাকে আর জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। ছেলেটি তার মাকে ডেকেই চলল। যে তাকে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত করত, আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরত, গালে চুমু খেত, সে যখন খাবার শেষ না করত, যখন দুষ্টুমী করত, তাকে বকুনি দিত। এসব কিছু তার স্মৃতিপটে একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল। সে অনুধাবন করছে, এসব কিছু তার জীবনে এখন ঘটনা। মায়ের স্নেহমাখা খুকুমণি ডাক আর শুনতে পাবে না সে। সে তখন মাকে আদরে সোহাগে জড়িয়ে ধরে উঠতে চাইল। আর সিংহ শাবকের ন্যায় বিলাপ করতে লাগল।

একটি ছোট্ট শিশু যে তার জীবনের সুখের দিনগুলো হারাতে শুরু করেছে। বিনিময়ে বড় বড় দুঃখ তার জীবনের সঙ্গী হতে চলছে।

একে একে চারদিন অতিবাহিত হলো। আমরা ভূগর্ভস্থ বাড়িতেই অবস্থান করতে লাগলাম। পুরোপুরি দিনের আলো হতে বঞ্চিত থেকে সময় কাটাতে লাগলাম।

ছোট্ট আলী সেই যে ঘুমিয়েছে আর জাগল না। ক্ষুধার তাড়নায় একসময় এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেল ওপারে। আসলাম পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। সে দুঃখযন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রলাপ বকছিল। আমিও তাকে কোনো ধরনের সাহায্য করতে পারলাম না। আমার চোখ হতে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল।

যখন বোমা বর্ষণ শেষ হলো, লোকজন আশ্রয়স্থল হতে বের হতে লাগল। তারা দেখল, তাদের গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেকেই এই পৃথিবীকে আলবিদা জানিয়ে চলে গেছে। দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য তাদের আর কখনো হবে না।

আমার পুত্রবধূ, নাতী আলী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন ছিল প্রতিটি ঘর। কান্নার চাপা গুঞ্জন ভেসে আসছে চারদিক হতে। মাতমের হা-হুতাশ ইথারে ইথারে। অশ্রু ঝরছিল প্রতিটি চেচেন মা-বোনের চক্ষু হতে। সেদিনের পর আমার চক্ষু থেকে অশ্রু কখনও শুকায়নি।

দাদু, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বড় হব। আমি অবশ্যই যুদ্ধে যাব এবং আমি আমার ছোট ভাই ও মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেব। আমি আসলামের দিকে তাকালাম। আর ভাবলাম, যুদ্ধ এ ছোট্ট শিশুটির জীবনে কী আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। তার এতটুকু জীবনে কী করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। অনাগত দিনগুলো তাঁর জীবনে কী প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হবে?

কিশোরী নাহিদ আমাদের প্রেরণার উৎস

'কোনো কালে একা হয়নি কোনো জয়ী পুরুষের তরবারী
শক্তি দিয়েছে প্রেরণা দিয়েছে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।'

কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই পঙ্‌ক্তি চিরন্তন সত্য। যুগ-যুগান্তরের প্রতিটি বীরত্বপূর্ণ অভিযানেই কোনো না কোনোভাবে তারা ভূমিকা রেখেছে। সকল যুদ্ধেই নারীরা ছিল পুরুষের প্রেরণার উৎস।

এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইসলামের প্রথম যুগে আরবের মা-বোনদের দিকে তাকালে। স্বামীকে নিজের মতো করে সাজিয়ে জিহাদে পাঠাতেন, সন্তানকে তলোয়ার ও খুনের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া জীবনের বড় এবং চূড়ান্ত স্বপ্ন ছিল। জিহাদের ময়দান থেকে পিঠ দেখিয়ে চলে এলে তিরস্কার করত সে যুগের নারীরা। পৃথিবীর সকল মায়া-মমতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধের তাদের ঈমানী জজবার সামনে কোনোই মূল্য ছিল না। নিজের চোখের সামনে আপন সন্তান শহীদ হয়ে যাচ্ছে, ধড় হতে মস্তক পৃথক হয়ে জমিনে গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাতেও তাদের আঁখিযুগল সিক্ত হয়নি বেদনার লোনা জলে। স্বামী আল্লাহর পথে কোরবান হয়ে যাবে যাক, তাতেও তারা এতটুকু দুঃখ অনুভব করেননি।

পাহাড়ের মতো অটল-অবিচল ছিল তাদের ঈমান। পৃথিবীর কোনো পরাশক্তি তাদের ঈমানের সামনে এসে টিকতে পারেনি। এমনি এক কিশোরী নারী—নাহিদ, সম্প্রতি আফগানিস্তানে বর্বর রুশ বাহিনীর হাতে তাকে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়। আফগানিস্তানে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখলের পূর্বেই সর্দার দাউদ নারীমুক্তির নামে আফগান ধর্মপ্রাণ নারীদেরকে মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে বেহায়াপনা আর বেলেল্লাপনার শেষ সীমায় নিয়ে এসেছিল। সর্দার

দাউদের উত্তরসূরি আমানুল্লাহর আমলেও নারী স্বাধীনতার সস্তা স্লোগান তুলে ইসলামের পর্দা-বিধানকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করার হীনপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি ঘৃণ্য অপচেষ্টাই আফগান জনসাধারণের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দুর্জয় ইসলামী চেতনার সামনে পরাজিত হয়েছে। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে গেছে শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের সামনে। এরপর যখন কমিউনিস্টরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নিল, তখন ফ্রি-সেক্সের নামে সে দেশের তরুণ-তরুণীদের বিপথগামী করার উদ্যোগ নেয় তারা। কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন তাদের মহিলা আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে ক্লাবে যোগ দিতে শুরু করে। রাস্তা-ঘাটে, শপিং সেন্টারে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় নারীদের অবাধ ও অসঙ্গত চলাফেরা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশীয় কমিউনিস্ট এজেন্টরা তাদের আত্মীয় মহিলাদের ঘরের বাইরে বের করে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছে যে, আফগানিস্তানে এখন অবগুণ্ঠিত মহিলাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। অবরোধবাসিনী নারীসমাজ এবার মুক্তবিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে কমিনিউজমের বিস্তীর্ণ ভুবনে। অল্পদিনের মধ্যেই নারীস্বাধীনতার চরম রূপ আফগানিস্তানের প্রগতিবাদী নাস্তিকরা দেখতে পেল। তাদের মা-বোন, কুলবধূ-কন্যা রত্নরা রুশ দখলদারবাহিনী ও অধিকৃত আফগানিস্তানে সমাগত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের হাতে হাত রেখে শুধু নৃত্য করছে তাই না, বরং উন্নতির এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন রুশীয় মুরব্বিদের বিছানায়ও তাদের যেতে হচ্ছে নিয়মিত। তখন আফগান কমিউনিস্ট পরিবারেও এমন কিছু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সচেতন মহিলা ছিলেন, যারা অন্যায় ও পাপাচারের এ উত্তাল সমুদ্রেও নিজেদের ঈমান ও ইজ্জত নিয়ে কঠিন পর্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়ে টিকে থেকেছেন। এমনি এক বোনের নাম নাহিদ। তাঁর পিতা একজন পাক্কা কমিউনিস্ট।

তাঁর পাষণ্ড পিতা সোভিয়েত প্রভুদের হৃদয়-মন জয় করার উদ্দেশ্যে তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু নাহিদ ওদের লাম্পট্যের আসরে আত্মাহুতি না দিয়ে পরিণত হয়েছে মুসলিম নারীজাতির জন্য পথপ্রদর্শক সুউচ্চ আলোর মিনারে। নাহিদ রাজধানী কাবুলের ঐতিহ্যবাহী রাবেয়া বসরী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির অসম্ভব মেধাবী ছাত্রী। তার বাবা

ফরিদ খান ছিলেন কাবুলের কমিউনিস্ট পার্টির একজন দালাল। ছোট বেলায় নাহিদের মা মারা যায়। একটু ধর্মভীরু ও নম্র প্রকৃতির মেধাবী ছাত্রী হিসেবে তাঁর নামও ছিল সকলের মুখে। আল্লাহ তায়ালা তাকে রূপ-সৌন্দর্যও দান করেছিলেন অন্য দশজনের চেয়ে বেশি। পরিবেশ ও শিক্ষার গুণে ছোটবেলা থেকেই নাহিদের মনে দেশপ্রেম ও ধর্মচেতনা শিকড় গেড়ে বসে। মুক্ত স্বাধীন মুসলিম আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রাসন ও খোদাদ্রোহী কমিউনিস্টদের শাসনক্ষমতা দখলে নাহিদের কোমল হৃদয় মারাত্মকভাবে আহত হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে তাঁর মনোভাব চেপে রাখে। মনের সঠিক অবস্থা বুঝতে দেয়নি বাড়ির কাউকে, বিচক্ষণ মেয়ে নাহিদ। একজন কমিউনিস্ট নেতার কন্যা হওয়ার সুবাদে বাড়িতে বসেই অনেক আগাম সংবাদ ও পরিকল্পনা জানার সুযোগ পেত সে।

অতএব আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও ইজ্জতের লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নাহিদ। এভাবে অনেক গোপন তথ্য আগাম জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আযাদির লড়াইয়ে সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি তাঁর স্কুলের সহপাঠিনীদের মাঝেও গোপনে জিহাদের উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। নাহিদের মতো সচেতন ছাত্রীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার সুফল হিসেবে গোটা আফগান-জিহাদে মুসলিম-নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। কাবুলের রাবেয়া বসরি গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা সেদিন আফগান মুজাহিদদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গগন বিদারী স্লোগান তুলে কাবুলের রাজপথে নেমেছিল।

এ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই একদা রুশবাহিনী ও কারমাল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের লক্ষ্যে কালো ওড়না উড়িয়ে রাজপথে বেরিয়েছিল। রুশবাহিনী এদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চালিয়েছিল নির্বিচারে। গুলিতে বহু ছাত্রী হতাহত হয়। সে মিছিলের পুরোভাগে একটি আফগান কিশোরী পতাকা বহন করছিল। সেনাবাহিনীর গুলিতে তার দু'টি হাতই অচল হয়ে যাওয়ায় সে তাঁর

সহপাঠিনীর হাতে পতাকাটি তুলে দিয়ে বলেছিল, এটা শক্ত করে ধরো বোন। এ তো ইসলামের পতাকা, এদেশের আযাদির পবিত্র ঝাণ্ডা এটা। একে কিছুতেই নিচে নামতে দিয়ো না।

আযাদির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এসব ছাত্রী নাহিদের স্কুলেরই বান্ধবী। নাহিদের বাড়িতে প্রায়ই ওরা বেড়াতে আসত। তাঁর পিতা ছিল একজন উচ্চ পদস্থ কমিউনিস্ট কর্মকর্তা। তাই বড় বড় অফিসাররা অনেক সময় নাহিদদের বাড়িতে আসত। একদিন জনৈক রুশ কর্মকর্তা নাহিদকে দেখে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তার মনে একটা কুমতলবের উদয় হয়। নাহিদের বাবা ফরিদ খানকে বলে, তোমার মেয়ের নাচ দেখতে হবে ফরিদ খান। সেনা অফিসারটি মনে মনে ভাবতে থাকে, এত খুবসুরত, সুন্দরী, রুপসী কন্যা ঘরে রেখে ফরিদ খান আমাদের সঙ্গে বেইমানী করছে। আরো আগেই তো মেয়েকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। মুক্ত চিন্তা ও উদার মনের অধিকারী, প্রগতিশীল কমিউনিস্ট নেতা ফরিদ খানের পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা ছিল নিতান্ত সহজ। এ ছাড়া রুশবাহিনীর সামনে 'না' উচ্চারণ করার অধিকার খোদ কাবুল সরকার প্রধানেরও নেই। কিন্তু ফরিদ খান ভালো করেই জানেন যে, তার মেয়ে নাহিদকে কোনো ক্রমেই ক্লাবে নিয়ে নাচানো যাবে না। তাই ফরিদ খান খুব নরম সুরে বলতে শুরু করলেন, নাহিদ খুব লাজুক স্বভাবের মেয়ে। ক্লাবে গিয়ে সে নাচতে রাজি হবে না। রুশ কর্মকর্তা ধমকের সুরে বললেন, তুমি না কমিউনিস্ট? ফরিদ খান দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, জি, অবশ্যই আমি কমিউনিস্ট।

এবার রুশ কর্মকর্তা অত্যন্ত রাগত সুরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, না, তুমি এখনো কমিউনিস্ট হতে পারোনি! কোনো কমিউনিস্টই এমন সেকেলে হতে পারে না। কোনো কমিউনিস্টের স্ত্রী-কন্যাই বিদ্রোহী মৌলবাদীদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না। আমাদের মেয়েরা তো স্বাচ্ছন্দ্যে নেচে-গেয়ে ক্লাবগুলোকে মাতিয়ে রাখে। যদি আসলেই তোমরা দেশের সত্যিকার উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি চাও, তবে খালেস কমিউনিস্ট হয়ে যাও। নিজেদের স্ত্রীদের তথাকথিত লজ্জা-শরমের শিকল

মুক্ত করে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ নিতে দাও। এ মহান (!) উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা এত দূর থেকে এসেছি তোমাদের কল্যাণে।

রুশ কর্মকর্তার এসব কথা শুনে ফরিদ খান খুব লজ্জিত হলো। ফরিদ খান ভাবছে, এরা কত কষ্ট করে দেশ, মাতৃভূমি ছেড়ে শুধু আমাদের স্বার্থে, আমাদের উন্নতি অগ্রগতির জন্য এত কষ্ট সহ্য করছে। আর আমরা এই সামান্য ত্যাগ দিতে পারি না? লজ্জায় তার মাথা নুয়ে এলো।

রুশ সেনা অফিসারটি ফরিদ খানকে প্রগতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে গেল।

নিজেকে পাক্কা কমিউনিস্ট প্রমাণ করার আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি রুশ প্রভুদের অসন্তুষ্টির ভয়ও ফরিদ খানের মনে ক্রিয়া করছে। মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করল। নাহিদ যদি ক্লাবে গিয়ে সেনাকর্মকর্তাদের সঙ্গে একটু নাচতে সম্মত হয়, তাহলে তাঁর বাবার পদমর্যাদা বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক। এসব কথা শুনে নাহিদ ভেতরে ভেতরে অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে। সে অত্যন্ত শান্ত অথচ কঠোর উচ্চারণে বাবাকে বলে, আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি বলেই একজন খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে এখনো আমি বসবাস করছি। আমি ভাবতেও পারি না যে, কোনো জন্মদাতা পিতা এতটা আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে। আপনি তো শুধু ইসলামকেই ত্যাগ করেননি; বরং আমাদের দেশীয় এবং সমাজিক নিয়ম-নীতিগুলো পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন।

ফরিদ খান তার একমাত্র কিশোরী কন্যাকে স্নেহমাখা কণ্ঠে বুঝাতে থাকেন, শোনো মা, তুমি বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, ইসলাম একটা মধ্যযুগীয় আদর্শ। সেই আদিকালের কিছু নীতিকথা। এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী সরলমনা জনসাধারণকে শোষণ করার উদ্দেশ্য এসব বিধি-নিষেধের জাল পাতছে।

দেড় হাজার বছর আগে ইসলাম হয়ত আধুনিক একটা জীবনাদর্শ হিসেবে সফল হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে বর্তমান উন্নতি ও প্রগতির যুগে

সেটিই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে কেন? কী করে সম্ভব হাজার বছর আগের একটা আদর্শ এ সময়েও মেনে চলা? নাহিদ, তুমি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ, লজ্জা-শরম ও শালীনতার দোহাই দিয়ে আফগান নারীসমাজের উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চলছে? এসব মোল্লা-মৌলবি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট, সেই আমেরিকার অবস্থাই চিন্তা করো। ওখানে তো নারীরা স্বাধীন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কল-কারখানায় কাজ করছে। সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল করছে। ক্লাবে অবাধে যাতায়াত করছে। এসব মৌলবাদীরাই শুধু ইসলামের নামে এ দেশীয় নারীসমাজকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যদি তুমি নিজেকে সময়ের সঙ্গে পরিচালিত না করো, তাহলে অনেক পেছনে পড়ে যাবে। আমি চাই, তুমি সামাজিক হও। তুমি যতটুকু সুন্দরী সে পরিমাণ সামাজিকতা যদি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহলে শুধু তোমার বাবার মর্যাদাই বাড়বে না, তোমার জীবনেরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। মনের মতো সঙ্গী পাবে তুমি। বড় বড় সোভিয়েত কর্মকর্তাও ঘুর-ঘুর করবে তোমাকে বিবাহ করার জন্য।

নাহিদের বাবা যে এত বেশি প্রগতিশীল হয়ে গেছে, আত্মমর্যাদাবোধ বা সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছুই যে তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই, এ বিষয়টি এত স্পষ্টভাবে কোনোদিন ধরা পড়েনি নাহিদের কাছে। নিজের কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েও স্বাভাবিক থেকে সে বলল, আপনি যে জীবনাদর্শকে মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন বলছেন, সেই জীবনাদর্শই নারীসমাজকে ওই মর্যাদা দিয়েছে যা আমেরিকা ও রাশিয়া দিতে পারেনি। ইসলামে মা-বোন-কন্যার যেই সম্মান রয়েছে দুনিয়ার অন্য কোনো আদর্শে বা ধর্মে কি সে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? স্ত্রীকে ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে তার কি কোনো তুলনা হয়? আপনার বক্তব্য শুনে তো আপনাকে বাবা বলতেও আমার লজ্জা হচ্ছে। আপনি নিজের দীন ও ঈমান বিক্রি করেছেন। নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ওই সোভিয়েত লাল কুকুরদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছেন। এখন নিজ কন্যার মান-ইজ্জতও নিলামে উঠানোর চেষ্টায় আছেন। আপনি কি চান যে, আপনার কন্যা ওই নাস্তিক কাফেরদের সামনে নৃত্য

করুক। তাদের হাতে হাত রেখে মাখামাখি করুক? আপনি এখন একজন ঈমান বিক্রেতা। দেশের পবিত্র স্বাধীনতা ও নিজ কন্যাসন্তানের সম্ভ্রমের সওদাগর।

মেয়ের বক্তব্য শুনে মি. ফরিদ খান ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাগে ফেটে পড়বেন যেন। মেয়েকে বললেন, তোমার ধর্ম কি তোমাকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, পিতার সঙ্গে এমন বেয়াদবিমূলক কথা বলবে, যে পিতা শুধু তোমার উন্নতি ও সুখের কথাই ভেবে থাকে?

নাহিদের স্পষ্ট জবাব, হ্যাঁ, আমার ধর্ম আমাকে এ শিক্ষাই দেয় যে, নিজের জন্মদাতা পিতাও যদি ইসলামবিদ্বেষী ও খোদাবিমুখ হয়ে যায়, তবে তার পিতৃত্বের বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যায়।

নাচতে যাওয়ার জন্য ফরিদ খান তার মেয়েকে অনেকভাবে রাজি করাতে চেষ্টা করল। প্রথমে আদর সোহাগ দিয়ে, অবশেষে ধমকের সুরে। শেষ পর্যন্ত জোর করেই একদিন ফরিদ খান নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে রুশ সেনা অফিসারদের হাতে তুলে দিয়ে সে বাইরে চলে আসে।

রুশ কর্মকর্তারা নাহিদকে নাচতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়। নাহিদ কিছুতেই নাচবে না। সে সুস্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আমি মুসলমান, আল্লাহর রাস্তায় আমার এ নগণ্য প্রাণটা দিয়ে দিতে পারি তবু আমি তোমাদের সঙ্গে নাচব না।

জনৈক অফিসার বলল, ইসলাম তো অনেক আগেই আফগানিস্তান হতে বিদায় নিয়েছে।

–আর এ ক্লাবের জলসাঘরে তোমার আল্লাহও আসবে না। নরম কথায় তুমি যদি রাজি না হও তবে অন্য পদ্ধতি আমাদের জানা আছে।

–তোমরা হয়ত ভুলে যাচ্ছ, আমি এক পাহাড়ি মেয়ে। সব ধরনের নিপীড়ন সহ্য করার মতো ধৈর্য ও মনোবল আমার রয়েছে।

–তোমার হয়ত জানা নেই, আমাদের হাতে এমন শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে, যা পর্বতকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম।

–আমার আল্লাহ তোমাদের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁর এক দুর্বল বাঁদীকে কষ্ট দিতে যদি তোমাদের এতই ইচ্ছে হয়, তবে ইনশাআল্লাহ আমাকে একটা মজবুত পাহাড়ের চেয়েও শক্ত ও সুদৃঢ় পাবে।

অফিসার নিরাশ হয়ে অবশেষে নির্যাতনের পথই বেছে নিল। নাহিদের গায়ের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ফেলল তারা। এরপর জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিতে লাগল তাঁর শরীরে। ছুরির খোঁচায় তাঁর শরীরে নিজের অপবিত্র নাম লিখতে লাগল সে পাষণ্ড অফিসার। সবকিছু চরম ধৈর্যের সঙ্গে মুখ বুজে সয়ে গেল নাহিদ। নাহিদ এমন এক পর্বত হয়ে গেল, যার সঙ্গে পাহাড় টক্কর দিলেও গুঁড়ো হয়ে যাবে।

এভাবে রাতভর তাদের পৈশাচিক নির্যাতন চলল কিশোরী নাহিদের উপর। রাতের শেষ দিকে নাহিদ এ নশ্বর পৃথিবীকে আলবিদা জানিয়ে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তার চেহারায় একফালি বিজয়ের হাসি লেগেই ছিল। নাহিদ শহীদ হয়ে গেল। কিন্তু সেনারা তাকে নাচাতে পারেনি। মৃত্যুর সময় নাহিদ শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে দুটো স্লোগান তুলে ছিল, আল্লাহু আকবার ও আফগানিস্তান জিন্দাবাদ। এটাই ছিল নাহিদের শেষ কথা। শহীদ হওয়ার পর রুশীয়রা নাহিদের অনাবৃত দেহ একটি মসজিদের চত্বরে ফেলে রাখে। ফজরের সময় মুসল্লিরা লাশটি দেখলে গোটা এলাকায় শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে আসে। পরদিন যখন স্কুলের ছাত্রীরা নাহিদের শাহাদাতের সংবাদ পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নেত্রী, তাদের বান্ধবীর লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য মসজিদ চত্বরে এসে সমবেত হয়। নাহিদের লাশ ছুঁয়ে তারা জিহাদের শপথ নেয় এবং তাঁর রক্ত দিয়ে মসজিদের প্রাচীরে একজন ছাত্রী লিখে দেয় আযাদী। মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বমুসলিমের অলস নিঁদ ভাঙাবার জন্য এমন নাহিদরা কি আবারও আত্মপ্রকাশ করবে না?

একজন বীর মহিলার ভাষণ

এমন একজন মহিলার বক্তব্য উল্লেখ করব, যাঁর সাহস, বুদ্ধিমত্তা শুধু প্রশংসাযোগ্যই নয়, অনুসরণযোগ্যও। শুধু নারীদের জন্যই নয়, পুরুষদের জন্যও রয়েছে এতে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। তৎকালীন তাঁতারি সরকারের শিকার এই মহিলা ছিলেন একজন জানবাজ মুজাহিদকন্যা। তাঁর সম্পর্কে তৎকালীন জনৈক মুজাহিদ নেতা হাতি বিন ইউসুফ বলেছিলেন, সূরাইয়া! ইসলামী বিশ্ব যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মতো মেয়ে জন্মাতে থাকবে, ততদিন কোনো শক্তিই মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। প্রতিযুগে তোমাদের মতো একজন করে সূরাইয়ার প্রয়োজন।

এই নির্ভীক বীর মহিলা প্রথমে নারীদের তারপর পুরুষদের উদ্দেশে যে ঈমানদীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, তা এখানে উল্লেখ করা হলো।

নারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন-

'মুসলমান সন্তানদের মধ্যে আগেকার সে শৌর্য-বীর্য এখন অবশিষ্ট নেই। তাই তোমরা এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে পড়েছ। তোমাদের মধ্যে সোনালি যুগের মুজাহিদদের মতো শাহাদাত বরণের সে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর নেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি, সেই বীর নারীরা আজ কোথায়, যারা একদিন ভাইকে, স্বামীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটতে দেখে তাঁবুর খুঁটি তুলে নিয়ে বলত, যদি তুমি কাপুরুষের পরিচয় দাও, তাহলে তোমার মস্তক এই লাঠির আঘাতে ভেঙে দেব।

'আমার বোনেরা! মনে রেখো, পতনমুখী জাতির শেষ অবলম্বন কওমের নারীরা। যতক্ষণ তোমাদের বুক ঈমানের নূরে দীপ্তিমান থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের পুত্রদের, স্বামীদের, ভাইদের দুনিয়ার কোনো শক্তি

পরাজিত করতে পারবে না। যতক্ষণ কওমের ঈমানদার মায়েদের পবিত্র দুধ রক্ত হয়ে তাদের সন্তানদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকবে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে শাহাদাতের গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জীবন্ত হয়ে থাকবে। আর যতক্ষণ ইসলামের বীর সন্তানদের মধ্যে জীবন্ত থাকবে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা, ততক্ষণ তারা যে-কোনো বড় শত্রুর জন্য বয়ে আনবে মৃত্যুর পয়গাম।

'কওম যদি প্রাণহীন মুর্দাই হয়ে থাকে, তাহলে পুনরুজ্জীবিত করার মতো আবে হায়াত রয়েছে তোমাদের হাতে। কওম ঘুমন্ত থাকলে তোমরাই তাকে ঝাকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙাবে। তোমরা পুরুষদের পথের শিকল হয়ো না। স্বামীদের বল, তারা যুদ্ধের ময়দান হতে মাথা উঁচু করে ফিরে আসুক। তোমরা ঘরের মধ্যে তাদের ইজ্জত-আবরু হেফাজত করবে।'

'ভাইদের বলো, তারা ময়দানে বুক পেতে দিয়ে তিরের আঘাত গ্রহণ করুক। তোমরা তাদের নিয়ে গর্ব করবে। পুত্রদের বলে দাও, ময়দানে যদি তারা কাপুরুষের পরিচয় দেয় আর পেছন থেকে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে তাহলে রোজ কেয়ামতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তোমরা আরজি পেশ করবে, যেন তিনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ না করেন। কারণ তারা তোমাদের দুধের মর্যাদা রক্ষা করেনি।'

পুরুষদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

'তাঁতারিদেরকে যারা ভয় করে তাদেরকে আমি ভাই মানতে রাজি নই। তাদেরকে বলে দিন, মুসলমান মায়ের দুধ পান করে বড় হয়েছে, এমন কোনো বালিকাও এ ধরনের কাপুরুষকে ভাই বলে স্বীকার করবে না। যদি তারা কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তাহলে আমরা হাতের কাঁকন খুলে তাদের পরিয়ে দেব এবং তাদের হাতের জংধরা তলোয়ার নিয়ে তাঁতারিদের সামনে দাঁড়াব। আমাদের ভালোবাসা ও আনুগত্য বাহাদুর সিপাহিদের জন্য, ভীরুদের জন্য নয়। তারা যদি আমাদের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে কেয়ামতের দিন

তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাদের কাতারে দাঁড়াবার আশা যেন না করে। সেদিন ইসলামের বীর নারীরা যদি কাউকে ভাই বলে স্বীকার করে, তাহলে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মতো মুজাহিদ, যিনি তাঁর কওমের একজন নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য মাত্র সতেরো বছর বয়সে একটি বিশাল রাজ্য জয় করেছিলেন। সেদিন মুসলিম নারী নিজের কাপুরুষ স্বামীকে ভুলে শাহাদাতের খুনে রঙিন পোশাক পরিহিত অপর কোনো বোনের স্বামীকে নিয়ে গর্ব করবেন। মুসলমান মায়েরা সেদিন বলবেন, আমাদের সন্তান সেই কাপুরুষ মানুষ নয়, যারা দুশমনদের তলোয়ারের আঘাতে বুক পেতে দিতে পারেনি। আমাদের সন্তান সেইসব বীর মুজাহিদ, যাদের শৌর্য-সাহস মুসলিম নারীকে করেছে দুনিয়ার নারীসমাজের চোখে সম্মানিত। তারা যদি চান যে, আমরা তাদেরকে ভাই বলি, তাহলে সামনে আসতে হবে খুনরাঙা পোশাক পরে; দেহে যখমের দাগ নিয়ে।'

একদিন এই মুজাহিদ মহিলা শহরের উচ্চবিত্ত খানদানের মহিলাদের তাঁর বাড়িতে দাওয়াত দিলেন। তাদের সামনে তিনি তাঁতারি জুলুমের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করে তাদের আবেদন জানালেন, তারা যেন পুরুষদের গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। অন্যথায়, নৃশংসতা ও বর্বরতার তুফান আশপাশের ইসলামী রাজ্যগুলোকে বরবাদ করে হিন্দুস্তানের দরজায় আঘাত হানবে। সম্মিলিত বিপদের মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রতিরোধের। সূরাইয়া তাদেরকে বুঝালেন, কওমের নারীরা কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিলে পুরুষদের মধ্যে কেউই গাদ্দারি করার সাহস করবে না। স্ত্রী স্বামীকে, বোন ভাইকে, আর মা তার সন্তানকে কওমের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করতে পারে। পুরুষদের ঐক্য ও ত্যাগই কওমের স্ত্রী-কন্যাদের হেফাজতের জামিন হতে পারে। সূরাইয়া হিন্দুস্তানের অবস্থা বিশ্লেষণ করে তাদেরকে বোঝালেন যে, সুলতান ও ওমারাদের অনৈক্যের অবসান না হলে তাঁতারিদের প্ররোচনায় দেশের কোটি কোটি অমুসলিম মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

সূরাইয়ার মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মহিলারা পুরুষদের বুঝিয়ে পথে আনার শপথ গ্রহণ করলেন। এ সূচনা ছিল খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। এরপর প্রত্যেক সন্ধ্যায় কোনো না কোনো মহল্লায় মহিলাদের জলসা বসতে লাগল। আর বীরাঙ্গনা সূরাইয়া তাতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

আজ যখন দুনিয়ার তাবৎ কুফরি শক্তি সন্ত্রাস নির্মূলের অজুহাতে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করে মুসলমানদের নির্মূল করছে জঘন্য কৌশলে, তখন কি সূরাইয়ার মতো আমাদের মা-বোনেরা কর্মদীপ্ত হয়ে পুরুষদের গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে না? মুসলিমদের মাঝে আজ সূরাইয়ার মতো বীর নারীদের বড় প্রয়োজন।

নির্যাতিতা ফাতিমার আর্তনাদ

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের কুখ্যাত আবুগারিব কারাগার। যেখানে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারীর উপর চলেছে বহু অমানসিক নির্যাতন। অবর্ণনীয় নির্যাতনে অগুনতি মা-বোন হারিয়ে যাচ্ছে এই দুনিয়া থেকে।

এই আবুগারিব কারাগারেই অতর্কিত হামলা চালায় ইরাকি মুক্তি-যোদ্ধারা। ইরাকি যোদ্ধাদের এই হামলা ছিল অপ্রত্যাশিত। দুঃসাহসিক এই হামলা চালানো হয়েছে ইরাকি কিশোরী ফাতিমার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে।

জানবাজ একজন ইরাকি যোদ্ধার বোন ফাতিমা। ওই ইরাকি যোদ্ধাকে আটক করার লক্ষ্যে তার বাড়ি ঘেরাও করে মেরিনসেনা। তাকে না পেয়ে তার বোন ফাতিমাকে ধরে নিয়ে যায় পাষণ্ড হায়েনারা। এরপর মার্কিন সেনারা তার উপর চালায় পাশবিক নির্যাতন। নির্যাতিত ফাতিমা বহুকষ্টে একটি চিঠি পাঠাতে সক্ষম হয় ইরাকি যোদ্ধাদের কাছে। এর উপর ভিত্তি করেই তারা অভাবনীয় দুঃসাহসিক হামলা চালায় আবুগারিব কারাগারে। ফাতিমাসহ অন্য ইরাকি বন্দিদের উদ্ধার করাই ছিল হামলার একমাত্র উদ্দেশ্য। কী লেখা ছিল ফাতিমার সেই চিঠিতে? এই প্রশ্ন সবার। ফাতিমার সেই চিঠির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো—

'মহান করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি।

'বলো, আল্লাহ এক, তিনি সবকিছুর একমাত্র স্বত্বাধিকারী। তিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি এবং কাউকে তিনি জন্ম দেননি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই, কিছুই নেই এবং ভবিষ্যতেও তাঁর সমতুল্য কেউ হবে না।

'প্রিয় ইরাকি মুক্তিকামী ভাইয়েরা, আমি শুরুতে সূরা ইখলাসের উদ্ধৃতি দিলাম। কারণ, এই সূরাটি আমার কাছে মহান আল্লাহর পরিচয়

তুলে ধরতে সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয়েছে। মুমিনদের অন্তরে এই সূরাটি গেঁথে আছে খুব দৃঢ়ভাবে।

হে আল্লাহর পথে লড়াইকারী প্রিয় ভাইয়েরা! আপনাদেরকে বলার আর কী আছে আমার? শুধু এতটুকু বলি, আমার মতো অসংখ্য ইরাকি বোনকে আটকে রাখা হয়েছে। মার্কিন নরপিশাচেরা তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। আমাদের পেটে এখন মার্কিন পশুদের বাচ্চা।

'প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আপনাদের ধর্মসম্পর্কের বোন। আমাকে একদিনে ৯বার শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়েছে। ধারণা করতে পারেন! আচ্ছা আপনার সহোদর বোনের যদি এভাবে শ্লীলতাহানী করা হত, কেমন লাগত আপনার? আমার মতো ১৩টি মেয়ে রয়েছে কারাগারের এই প্রকোষ্ঠে। সকলেই অবিবাহিতা। মার্কিন সেনারা আমাদের শরীর থেকে পোশাক কেড়ে নিয়ে গেছে। সকলের সামনেই তারা আমাদের শ্লীলতাহানী করে। এই হচ্ছে আমাদের এখানকার দিনলিপি! আমাদের এখানকার একটি মেয়ে নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এক মার্কিন সেনা তার শ্লীলতাহানির পর তার বুক ও উড়ুতে প্রচণ্ড আঘাত করে। তার উপর এমন অত্যাচার করা হয় যা কল্পনাও করতে পারবেন না। এরপর মেয়েটি দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন আশা রাখি। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আমরা ইরাকি মেয়েরা যা কখনও কল্পনাও করতে পারিনি সেরকম ভয়াবহ নিষ্ঠুর নিপীড়ন, অপমান আর লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হয়েছি।

এর চেয়ে মর্মান্তিক এই দুনিয়ায় আর কিছুই হতে পারে না। আর এই যন্ত্রণা কেউ কখন ভাষায়ও প্রকাশ করতে পারে না। কারাগারে প্রতিরাতেই নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। মার্কিন পশুগুলোর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। পশুগুলো এসেই আমাদের শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে যায় আমাদের। পশুগুলোর অত্যাচার থেকে একটি রাতও মুক্তি পাই না আমরা। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। আপনারা আবুগারিব

কারাগারে হামলা করুন। আমাদেরসহ তাদের ধ্বংস করে দিন। আমাদেরকে এখানে ফেলে রাখবেন না। অনুগ্রহ করে আমাদেরসহ তাদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিন। ট্যাংক আর জঙ্গি বিমানকে পরোয়া না করে ছুটে আসুন নরকখানায়। আমাদের প্রতি এতটুকু মায়া রাখবেন না প্লিজ। আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদেরসহ তাদের মেরে ফেলুন। আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে যেই সতীত্ব রক্ষা করে চলি চিরদিন, সেই সতীত্ব এই পশুদের হাতে খুইয়ে ফেলেছি। এখন আর বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই। আমরা পবিত্র কুরআনকে গলায় ঝুলিয়ে রাখি। সেই কুরআন তারা ছিঁড়ে ফেলে। আমাদের চারপাশে তারা পবিত্র কুরআনের পাতা ছিঁড়ে ফেলে রাখছে।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আবারও অনুরোধ করছি, তাদের হত্যা করুন। ধ্বংস করে দিন। আর আপনাদের হামলার ফলে যদি আমরাও ধ্বংস হয়ে যাই, তাতেও শান্তি পাব। আমরা মৃত্যুর মাধ্যমেই মুক্তি পেতে চাই এই জাহান্নামের বিভীষিকা থেকে। অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।'

ফাতিমার চিঠিটি পাওয়ার পর প্রায় একশ ইরাকি মুজাহিদ আবূগারিব কারাগারে হামলা চালায়। তারা মার্কিন সেনাদের কারাগারের কম্পাউন্ডকে পিছু হটে যেতে বাধ্য করে। ইরাকি যোদ্ধারা ৮২ এম এম এবং ১২০ এম এম মর্টার সেল নিক্ষেপ করে মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে। অবশেষে কারাগারের একটি দেওয়াল ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়। মাখফারাত আল-ইসলামের বাগদাদ প্রতিনিধির এক প্রতিবেদনে এ খবর জানা যায়। তবে এই পত্র লেখিকা ফাতিমা ও তার সঙ্গে থাকা হতভাগ্য অন্যান্য ইরাকি কিশোরীর ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা জানা যায়নি। ইসলামপন্থী যোদ্ধাদের একটি ওয়েব সাইডে লেখা হয়েছে, দুঃখিত বোন! আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষ নই। সত্যিই যদি মানুষ হতাম, তাহলে তোমার চিঠির জবাবে আমরা আবূগারিব কারাগার ধুলোয় মিশিয়ে দিতাম।

বীর নারী হিবার আত্মোৎসর্গ

নাম হিবা দারাগামেহ। বয়স ১৯ বছর। পশ্চিম তীরের তুবাস শহরে তার বাড়ি। আল-কুদুস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অসম্ভব মেধাবী ছাত্রী। কখনো কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলেনি সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটিরায় কখনো এক কাপ চা বা কফি পান করেনি। তার আপাদমস্তক সর্বদা বোরকায় আবৃত থাকত। বাইরের বিশ্ব তার বাদামি রঙের চোখদুটো দেখতে পেত। হিবার বান্ধবী ছিল শুধু মেয়েরা।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তার চাচাতো ভাই রাদ দারাগামেহ জানান, আমি কখনো তার মুখ দেখিনি। কখনো তার সঙ্গে কথা বলিনি, হাতও মিলাইনি কখনও। বিশ্ব তার অনাবৃত মুখ প্রথম দেখতে পায় একটি পোস্টারে। ২০০৩ সালের ১৯ মে এক আত্মঘাতী হামলায় হিবা শাহাদাত বরণ করার পর তার পোস্টার প্রকাশ করে। হিবা আত্মঘাতী হামলাকারিণী। ইসলামী জিহাদের সদস্য হিবা ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর আফুলায় একটি বিপণী কেন্দ্রের বাইরে ওই আত্মঘাতী হামলা চালায়। হামলায় তিন জন ইসরাইলি ইহুদি নিহত এবং অপর তিন জন আহত হয়।

২০০৩ সালের ১৯ মে সকালে হিবা অন্যান্য দিনের মতো বাড়িতে আসে। সে দিনটির কথা স্মরণ করতে গিয়ে হিবার মা ফাতিমা বলেন, হিবা যথারীতি ভোরে ঘুম থেকে জেগে ফজরের নামায আদায় করে। এরপর বাড়ির সবার জন্য সে চা নাশতা তৈরি করে। আমরা সবাই তার বানানো নাশতা খেলাম। এরপর হিবা সমস্ত থালা-বাসন ধুয়ে রাখল। তারপর দেখি হিবা বাড়ির বাইরে বাগানে, যেখানে রয়েছে কাঠবাদাম, জলপাই ও ডালিম গাছ, রয়েছে গোলাপের বেশ কয়েকটি গাছ। হিবা

গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে প্রশান্ত মনে। এ সময় দেখি সে একটি গোলাপ গাছের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি হাসির কারণ জানতে চাইলে হিবা উত্তরে বলল, আজ আমার মনে হচ্ছে আমি একজন নতুন মানুষ। আমি বলে রাখি তোমরা আমাকে নিয়ে গর্ব করবে। এরপর সে প্রতিদিনের মতো হিজাব পরে চলে গেল।

শহর ছাড়ার আগে হিবা তার দুই বোন জিহান ও মারয়ামের সঙ্গে দেখা করতে যায়। তার ক্লাসের এক বন্ধুর নোট বুক ফেরত দেয়। বিদায় জানাতে দাদিমার কাছে যায়। তুবাসে সর্বশেষ তাকে যখন দেখা যায়, তখন তার পরনে ছিল বোরকা।

চার ঘণ্টা পর তাকে যখন আফুলায় দেখা যায় তার পরনে ছিল টি-শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট। কোমরে বাঁধা ছিল বিস্ফোরকযুক্ত বেল্ট।

লক্ষবস্তুতে আঘাত হানল সাফল্যের সঙ্গে। সারা পৃথিবীর মানুষ তখন তাকে জানতে পারল ৩২ মাস আগে ফিলিস্তিনের ইনতিফাদা বা গণঅভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর এই নিয়ে পাঁচজন ফিলিস্তিনি নারী শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করতে আত্মঘাতী হামলা চালায়।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে হিবা একজন সন্ত্রাসী হলেও তার পরিবার এবং বিশ্বের মুসলিম নারীদের কাছে তিনি গর্বের ধন। তবে তারা এও জানিয়েছে যে, হিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। কিছুই জানতাম না আমরা।

হিবা ছিল একজন ধর্মপ্রাণ নারী। হিবার মা জানান ১৫ বছর থেকেই সে বোরকা পরতে শুরু করে। দাদিমা এসব ছেড়ে দিতে বললেও কান দেয়নি তার কথায়। পাঁচওয়াক্ত নামায তো পড়তই। অবসর পেলেই কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেত। তুখোর মেধাবী ছাত্রী হিবা সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলোতে অসম্ভব ভালো ফল করেছে।

কেন বা কীসের তাগিদে হিবার মতো একজন ধর্মপ্রাণ ও মেধাবী মেয়ে এমন একটি ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে তা ভাবিয়ে তোলে

অনেককে। আসলে এমন একটি নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক পরিবেশে হিবা বড় হয়েছে যেখানে সর্বদা ইসরাইলি পাষণ্ডরা বুলেট দিয়ে নিরস্ত্র নারী-শিশু নির্বিশেষ সকলকে গণহারে হত্যা করছে। প্রতিদিন তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে। হিবা এসব দৃশ্য বহুবার দেখেছে। এসব বিভৎস দৃশ্য হিবাকে এমন দুঃসাহসিক পথে অগ্রসর হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। জাজিরাতুল আরবের ভীরু কাপুরুষ শেখদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা বিলাসবহুল বালাখানায় লম্বা লম্বা জুব্বা পরে বসে থাক। ঈমান ও আযাদির ময়দানে আমরা লাখও হিবা জীবন দিয়ে যাব।

হিবা, তুমি অমর! তুমি বিজয়িনী। তুমি জালিমদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার উদাহরণ। তুমি নারীজাতির অহঙ্কার। তুমি আমাদের জেগে উঠার প্রেরণার উৎস।

একজন বীরদীপ্ত নারী

এসো হে নবীন, এসো আল্লাহর পথে। এসো, আল্লাহ তোমাদের জান্নাতের দিকে ডাকছেন।

এ এক বৃদ্ধা বীর নারীর আহ্বান। একজন মুসলমান বৃদ্ধা শহরের বাজারে গিয়ে উঁচু আর গুরুগম্ভীর স্বরে লোকজনকে জিহাদের প্রতি আহ্বান জানাত।

মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সময়। জায়গায় জায়গায় ইংরেজ বাহিনী ঘাঁটি গেড়ে জেঁকে বসেছে মুসলমানদের উপর। দফায় দফায় আক্রমণ করে মুসলমানদের ঐক্যকে মিসমার করতে লাগল তারা। সম্মিলিতভাবে ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ আর অবশিষ্ট রইল না। চোখ বুজে কাফেরগোষ্ঠীর আক্রমণ সহ্য করতে লাগল নিরীহ মুসলমান। সে সময় ইংরেজ তাদের ঘাঁটির জন্য বেছে নিয়েছিল বিভিন্ন টিলা ও পাহাড়। সেখান থেকে কাশ্মিরের দিক থেকে দিল্লি পর্যন্ত নির্বিচারে গুলি চালাত তারা। সে সময় সবুজ পোশাকধারী একজন বৃদ্ধা নারী উল্লিখিত আওয়াজে শহরবাসীদের একত্রিত করত। শহরবাসীরা এই ডাক শুনে চারদিকে জড়ো হত। আর তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি কাশ্মিরী গেটের উপর আক্রমণ করতেন। এভাবে শহরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ চালাতেন।

সেই নারী মুজাহিদ ছিলেন অসম সাহসী, নির্ভীক। মৃত্যুভয় তাঁর মোটেই ছিল না। গোলাবৃষ্টির মধ্যে তিনি বাহাদুর সিপাহির মতো এগিয়ে যেতেন। কখনো পদাতিক, কখনোবা অশ্বারোহিনী। বন্দুক, তলোয়ার ও একটি পতাকা থাকত তাঁর নিকট সর্বদা। খুব দক্ষতার সঙ্গে বন্দুক চালনা করতেন তিনি। অনেকবার দেখা গেছে তিনি সৈনিকদের সঙ্গে মুখোমুখি তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছেন।

সেই নারীর বীরত্ব ও নির্ভীকতা দেখে শহরের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ত এবং এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ত। যেহেতু যুদ্ধের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। তাই প্রায়ই রণাঙ্গন হতে তারা পলায়ন করত। পরে বাধ্য হয়ে তাঁকেও ফিরে আসতে হত। কেউ জানত না সে কোথায় যায় আর কোথা হতে আসে।

এভাবে একদিন এমন হলো যে, সে উত্তেজনা ও উন্মাদনায় আক্রমণ চালাতে চালাতে, বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে ও তলোয়ার চালাতে চালাতে ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং ঘোড়া হতে পড়ে গেলেন। ইংরেজ বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে ফেলল। তারপর কেউ জানে না তাঁকে কোথায় নেওয়া হয় এবং তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল?

দিল্লির প্রাদেশিক সরকার কিছু ইংরেজি পত্র প্রকাশ করেছে যা দিল্লি ঘেরাও করার সময় ইংরেজ সামরিক অফিসারেরা লিখেছিল। এসব চিঠিপত্রের মধ্যে একটি চিঠি লেফটেন্যান্ট ডবলু এস আর হাডসনের, যা তিনি দিল্লি ক্যাম্প থেকে ২৯ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে মিস্টার জে. গিলসন ফরসাই, ডেপুটি কমিশনার আম্বালাকে পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রের মধ্যে ওই মুসলিম বৃদ্ধার বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া আছে। পত্রের মন্তব্য এই ধরনের—

'মাই ডিয়ার ফরসাই, তোমার কাছে একজন মুসলমান বৃদ্ধা পাঠাচ্ছি। অদ্ভুত ধরনের এক নারী। সবুজ রঙের পোশাক পরে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করত। আর নিজেই হাতিয়ার নিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে ঘাঁটির উপর আক্রমণ করত। যেসব সৈনিকের সঙ্গে ওর মোকাবেলা হয়েছে তারা বলে যে, সে বহুবার সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে হাতিয়ার চালায়। আর ওর শক্তি পাঁচটি পুরুষের সমান।

যেদিন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, সেদিন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে শহরের বিদ্রোহীদের সৈনিক কায়দায় লড়াচ্ছিল। তাঁর বন্দুক দিয়ে সে অনেককে হত্যা করেছে। অবশেষে তাঁর সঙ্গীরা সব পালিয়ে যায়। আর সে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হয়। জেনারেলের সামনে পেশ করা হলে

তিনি তাকে নারী ভেবে মুক্ত করে দেওয়ার আদেশ জারি করেন। কিন্তু আমি তাকে নিরস্ত করি। বলি, যদি একে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে শহরে ফিরে গিয়ে নিজের দৈবশক্তির ব্যাপারে ঘোষণা করবে এবং অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজালে বাঁধা লোকেরা এর মুক্তি কোনো দৈবশক্তির পরিণাম বলে মেনে নেবে। হতে পারে ছাড়া পাওয়ার দরুন এই নারী ফ্রান্সের সেই বিখ্যাত নারীর মতো আমাদের জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে। ফরাসি বিদ্রোহের ইতিহাসে যার উল্লেখ আছে। [ফ্রান্সে বিদ্রোহের সময় জোয়ন অব আর্ক নাম্নী এক নারী এভাবেই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। হাজার হাজার লোক তাকে দৈবশক্তির প্রতীক মেনে নিয়ে তার পক্ষ নেওয়ায় ভীষণ যুদ্ধ ও রক্তপাত হয়। জনসাধারণ ভাবত এই নারী কখনো মরবে না। অবশেষে ফ্রান্সের বিরোধী দলের সেনারা তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে। তবেই উপদ্রব শান্ত হয়। সেই নারীর সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে পত্রের মধ্যে।]

'জেনারেল আমার কথা মেনে নিলেন এবং মহিলাটিকে বন্দি রাখার আদেশ দিলেন। মহিলাটিকে আপনার নিকট পাঠানো হচ্ছে। আশা করি আপনি একে কয়েদ করে রাখার সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কেননা এই ডাইনি ভীষণ বিপজ্জনক।' হাডসন।

সমাপ্ত